বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ

মোঃ আবদুল মোহাইমেন

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলাদেশের অর্থনীতি

www.pathagar.com

লেখকের বক্তব্য

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি আমি ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৮ সনের মধ্যে লিখেছিলাম। প্রবন্ধগুলিতে তখন যে বাজার দর, পরিসংখ্যান, বক্তব্যগুলি উল্লেখ করেছিলাম, গত কয়েক বৎসরে তার অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শুল্ক ও বিক্রয় করের যে হার উল্লেখ করেছি গত কয়েক বৎসরে তার মধ্যেও অনেক হেরফের হয়েছে। তখন যে এম এস রডের টন প্রতি পাঁচ ছয় হাজার টাকা উল্লেখ করেছি তা বর্তমানে চৌদ্দ পনর হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে। যে ড্রাইসেল ব্যাটারির মূল্য ৫/৬ টাকা উল্লেখ করেছি তা এখন ১২/১৪ টাকা হয়ে গেছে। যেখানে এক একটি আইটেমের মারফৎ শোষনের অঙ্ক ২০/২৫ কোটি টাকা বলেছি তা বর্তমানে ৪০/৫০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সেক্টারে কারখানার সংখ্যা যেখানে তিন চারটি বলেছি সেখানে হয়ত ৭/৮টি হয়েছে। রিরোলিং মিলের সংখ্যা যেখানে ৩০/৩২টি বলে উল্লেখ করেছি সেখানে বর্তমানে ৭৫/৮০টি কারখানা হয়েছে। যেখানে ড্রাইসেল ব্যাটারির কারখানার সংখ্যা ৪/৫টি বলেছি সেখানে বর্তমানে প্রায় ১২/১৪টি কারখানা হয়েছে। কর্মচারীর সংখ্যাও তদনুপাতে কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও জনসাধারণকে শোষনের ধারা ও কৌশল পূর্বের ন্যায়ই অপরিবর্তিত রয়েছে।

আমার বহু বন্ধু-বান্ধব যারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি পড়েছিলেন তারা আমাকে বই এর আকারে এগুলি প্রকাশ করবার জন্য অনেকদিন থেকে অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। কিছুটা আলস্য ও কিছুটা শারীরিক অসুস্থতার জন্য এযাবৎ বই এর আকারে এগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ইচ্ছা ছিল অর্থনীতির উপর বর্তমান পরিস্থিতির উপর আরো কয়েকটি নূতন প্রবন্ধ লিখে অর্থনীতির উপর রচিত সমস্ত প্রবন্ধগুলিই একটি বইএর আকারে বের করব। কিন্তু 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ' এই বইটি বের করতে গেলে অর্থনীতির উপর পূর্বের লেখা প্রবন্ধগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এখনও সঠিক ও ক্রিয়াশীল রয়েছে বলে বন্ধু-বান্ধবেরা পূর্বোক্ত বই-এর সঙ্গে এগুলিকে দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে

www.pathagar.com

জুড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন, কারণ প্রবন্ধগুলি বাংলাদেশের অর্থ-নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বলে মূল বইয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হবেনা বলে তারা মনে করেন।

প্রবন্ধগুলি পড়বার সময় ভূমিকার প্রথমাংশে বর্ণিত পরিসংখ্যান, তৎকালীন বাজার দর ও বর্তমান মূল্য বৃদ্ধির কথা স্মরণ রাখতে পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ আবদুল মোহাইমেন

www.pathagar.com

['আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্পর্কে দু-একটি কথা' এ প্রবন্ধটি ১৯৭২ এর মাঝামাঝি লিখেছিলাম। তখন আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সে প্রচেষ্টায় সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে প্রবন্ধটির ভূমিকা হিসেবে নীচের প্যারাগ্রাফটি লিখেছি।]

দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক নিয়মগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন ভাবে চলতে থাকে যে ব্যক্তি বিশেষের হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জমা হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না। কিন্তু ঐ অর্থনীতি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিবাদ অর্থনীতির দৌরাত্ম্যে সমাজে শোষনের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত আকারে থাকে। তাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবেশের পূর্বে কতিপয় অর্থনৈতিক বিধিনিষেধের মারফত এই শোষণের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে সংকুচিত করে সমগ্র অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সমাজতান্ত্রিক অবস্থার অনুকূল করে নিয়ে আসার প্রয়োজন হয়। আমি আমার এই নিবন্ধে এই ধরনের কতকগুলি অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবেশের পূর্বে আমাদের দেশেও আরোপিত হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে যারা চিন্তাভাবনা করেন আমার এ লেখার মাধ্যমে তাদের আলোচনা ও বিবেচনার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব রাখছি। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, যে কয়টি ব্যবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি সেগুলি ছাড়াও আরও কতিপয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে—যেমন বিলাসদ্রব্য, টেলিভিশন, ফ্রিজিডেয়ার ও দামী পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যবহার—বারান্তরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রাখি।

www.pathagar.com

আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্পর্কে দু-একটি কথা

জুন, ১৯৭২

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণের ও হাজার হাজার নারীর ইজ্জতের বিনিময়ে, আমাদের এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এই স্বাধীনতার ফল মুষ্টিমেয় লোকের ভোগের জন্য নয়; সাত কোটি মানুষের সুখ সমৃদ্ধির জন্য, তাঁদের দারিদ্র্যপীড়িত অভিশপ্ত জীবনের অবসানের জন্য একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে উঠুক, এটাই লোকের কাম্য। বঙ্গবন্ধুও বলেছেন ভৌগলিক স্বাধীনতা কোন কাজেই আসবে না, যদি সাধারণ মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও কাজের সংস্থান না করা যায়। এই সমাজ গড়তে গেলে আমাদের এরূপ বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যে দেশের সম্পদ পূর্বের মত মুষ্টিমেয় কতগুলো লোকের হাতে জমা না হয়ে, জমি ও কারখানা থেকে উৎপাদিত সম্পদ বা মুনাফা দেশের অধিকাংশ লোকের মধ্যে বিতরিত হয়। এর জন্য, অর্থ-নৈতিক নিয়মগুলো এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে, সম্পদ আপনাআপনি ভাবেই দশজনের মধ্যে বিতরিত হয়ে যাবে। এমন অর্থনৈতিক নিয়ম কখনই সমর্থনযোগ্য নয়, যার মাধ্যমে একজন যত টাকা খুসি মুনাফা করার সুযোগ পাবে, আবার ট্যাক্স করে তার কাছ থেকে মুনাফার বিরাট অংশটা উশুল করে সমাজের হিতার্থে ব্যয় করা হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ফ্রি ইকনমি বা অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে একবার অর্থের অধিকারী হয়েছে তার কাছ থেকে ট্যাক্স করে কখনই মুনাফার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ উশুল করা সম্ভব হয় নাই। তাই আমাদের লক্ষ্য হবে, একজনের হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ যাওয়ার পথই বন্ধ করে দেওয়া। ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়াবারও পূর্ণ সুযোগ থাকবে আবার সে জীবানু নষ্ট করার জন্য ওষুধেরও বন্দোবস্ত থাকবে, এটা কোন কাজের কথা নয়।

এখন আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে দেশের উৎপাদিত সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যাওয়ার পথ বন্ধ করার উপায় কি?

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা হয়ে যায়, জমি থেকে উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্য, কলকারখানা থেকে উৎপাদিত ও বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্যদ্রব্য বেচা-কেনার মারফৎ। এ ছাড়া আরও দু-একটি পথে মুষ্টিমেয়ের হাতে ধনসম্পদ জমা হয়, তবে উপরে উল্লেখিত পথগুলোই প্রধান। জমি থেকে যে শোষণ হয় তা বন্ধ করা খুব শক্ত নয়। পরিবারপ্রতি সর্বোচ্চ কৃষিজমির সীমা বেঁধে দিয়ে উদ্বৃত জমিগুলো ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেই মোটামুটি এ শোষণ অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কলকারখানা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মারফৎ যে শোষণ হয়, তা বন্ধ করা খুবই কষ্টসাধ্য। এটা করতে গেলে আমাদের প্রথম বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ একজন বা দুজন লোক ঐ প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার লোককে বঞ্চিত করে সমস্ত মুনাফা কুক্ষিগত করার সুযোগ পায় কি করে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এটা সম্ভব হয় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পার্টনারশীপ হোক, প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড হোক, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃত্ব দু-চারজন লোকের হাতেই জমা হয়। এটা বন্ধ করার জন্য সমগ্র শিল্প ও বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিক-কর্মচারী ও মালিকদের যৌথ পরিচালনাধীন করতে হবে। বড় বড় শিল্প কলকারখানায় দেখা গেছে মালিকেরা একাউন্ট্স ডিপার্টমেন্টের লোকদের সহায়তায় হিসাবের কারচুপি করে সরকার এবং শ্রমিক উভয়কেই ফাঁকি দেয়। সত্যিকারের উৎপাদন ব্যয় কত ও বৎসরান্তে সঠিক মুনাফা কত তা সাধারণ শ্রমিকেরা না জানলেও একাউন্ট্স বিভাগের লোকদের কাছে লুকাতে পারে না। বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অবস্থায় প্রধান বা তার সহকারী হিসাব রক্ষাকারী কর্মচারীদের কিছু মোটা মাহিনা বা বখ্‌শিশ দিয়ে মালিকেরা হাত করে রাখে। ব্যালান্স শীটে পুকুর চুরি হয়েছে জেনেও ব্যক্তিগত লাভালাভ বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাকুরী হারাবার ভয়ে তারা মালিকের দুষ্কৃতিতে পুরাপুরি সাহায্য করে। তাই মালিকানার ভিত্তিতে এরাও যদি পরিচালনা বোর্ডে থাকে তবে সম্পূর্ণ মুনাফাই হিসাবে আসবে এবং সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী নতুন নতুন কারখানা ও সমাজ-

www.pathagar.com

কল্যাণের জন্য উক্ত সম্পদের প্রয়োগ সম্ভব হবে। এভাবে সরকার ও সমগ্র দেশকে ফাঁকি দিয়ে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধনসম্পদ জমা হওয়ার পথ কার্যকরীভাবে বন্ধ হবে।

বড় বড় কলকারখানার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে যারা অধিষ্ঠিত থাকে, তাদের কারখানার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার কাঁচামাল খরিদ ও উৎপাদিত জিনিস বিক্রির ব্যাপারে মোটা টাকা নিজের পকেটে নেওয়ার কোনও না কোনভাবে সুযোগ থাকে—এটা শ্রমিক বা কর্মচারীদের জানার কোন সুযোগ অনেক সময় থাকে না। এর মারফৎ প্রচুর অর্থ মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হয়। এর ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, পরিচালন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এযাবত সরকার পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এসব ঘটে এসেছে বলেই সরকার পরিচালিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই বৎসরের শেষে লাখ লাখ টাকা লোকসানের ভাগী হয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে অফিসারদের এরূপ চুরির সুযোগ খুব কম থাকে, কারণ এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি মালিকেরা নিজেরাই সাধারণতঃ করে থাকেন। শুধু বড় বড় কল-কারখানায় নয়—সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যেসব অফিসার রয়েছেন তাদের হাতের ভিতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট এবং লাইসেন্স বিতরিত হয়। এই সমস্ত লাইসেন্স ও কন্ট্রাক্টের বিনিময়ে এইসব অফিসার-দের হাজার হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার সুযোগ থাকে। যে সমাজ ব্যবস্থায় ধনসম্পদ উপার্জন করে তা খরচ করারও সুযোগ থাকে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত অধিকাংশ অফিসারই পদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে কন্ট্রাক্টার বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হাজার হাজার কখনও লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেয়।

এভাবে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধনসম্পদ জমা হওয়া বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো এরূপ অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ যাতে উপার্জনকারী খরচ করতে না পারে, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এটা মনে রাখতে হবে এভাবে উপার্জিত অর্থ কেউ বস্তাবন্দী করে ঘরে ফেলে রাখে না। টাকা ভোগের জন্যই উপার্জন করে। এ টাকা দিয়ে সে জমি কেনে, নয় বাড়ী বা গাড়ী কেনে, নয় বেনামীতে কোনও ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখে। যারা ঘুষ খেয়ে মোটা টাকা উপার্জন করে

www.pathagar.com

তাদের পক্ষে উপরে লিখিত পদ্ধতিতে টাকাটা খরচ করতে না পারলে শুধু খাওয়া দাওয়া বেশী করে কখনও খরচ করতে পারে না। তাই এভাবে উপার্জিত অর্থ খরচ করার পথ বন্ধ হয়ে গেলে অযথা ঝুঁকি নিয়ে এরূপ অন্যায়ভাবে উপার্জনের প্রবণতা অনেকটা কমে যাবে। **অসৎভাবে উপার্জিত অর্থ খরচ করার পথ বন্ধ করতে হলে প্রথমেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি আইন করে সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।** এরূপ যদি আইন হয় যে, কোন লোক বা তার পরিবারের কেউ শহরে বাস্তুভিটার জমি, যত টাকারই মালিক হোক না কেন, ৩ বা ৫ কাঠার বেশী খরিদ করতে পারবে না; কোন লোক এক-টার বেশী বাড়ি করতেই পারবে না; আবার সেই বাড়ি কত কামরার বা কত বর্গফুটের হবে তা-ও সরকারকে জানিয়ে যথারীতি অনুমতি নিয়ে করতে হবে; সরকারের কাছে আবেদন করলে ভারপ্রাপ্ত কমিটি দরখাস্তকারীর পরিবারের লোক-সংখ্যা ও আয় বিবেচনা করে প্রয়ো-জনীয় কামরা ও আয়তন অনুমোদন করবেন। এটা এইজন্য প্রয়োজন—যে ৩ বা ৫ কাঠার উপর একজন ইচ্ছা করলে ২০ বা ২৫ লাখ টাকার বাড়িও করতে পারে।

জমি ও বাড়ির পর আইন করতে হবে গাড়ী কেনা সম্বন্ধে। ঘুষ বা সরকারকে ফাঁকি দেওয়া উপার্জিত অর্থ দিয়ে অফিসার বা ব্যবসায়ীরা প্রায়ই দেখা যায় বছর বছর নতুন নতুন গাড়ী কেনে। আইউবী আমলে এক একজন অফিসারকে ৩-৪ খানা গাড়ী রাখতে দেখা গেছে। একখানায় সাহেব অফিসে যান, একখানায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করে এবং বাকীখানা দিয়ে বিবিসাহেবা মার্কেটিং ও ক্লাবে যাতায়াত করেন। অবারিত সুযোগ ছিল বলেই অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ এইসব অফিসারেরা খরচ করে ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল। এখন থেকে নিয়ম করতে হবে যে কোন লোক গাড়ী কিনতে গেলে সরকারের কাছে তার আয় ও জীবিকা উল্লেখ করে, তারজন্য গাড়ী একান্ত প্রয়োজন তা প্রমান করে গাড়ী কেনার অনুমোদন নিতে হবে। অর্থাৎ পকেটে টাকা থাকলেই যে কেউ ইচ্ছা করলে গাড়ী কিনতে পারবে না। এইসব বিধিনিষেধ এইজন্য প্রয়োজনীয় যে, বহু লোক দেখা যায় বিভিন্ন বেনামীতে ব্যবসা করে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করে কিন্তু কখনও কোনও আয়কর দেয় না, কিন্তু

www.pathagar.com

প্রতি বৎসরই নতুন নতুন গাড়ী কিনে ঘুরে বেড়ায়। এই ব্যবস্থায় গাড়ী কিনতে গেলে এরা যেমন আয়কর দিতে বাধ্য হবে, তেমনি ঘুষের টাকা দিয়ে অফিসাররাও আর গাড়ী কিনতে পারবে না।

এরপর আইন করতে হবে ব্যাঙ্কে **স্থায়ী আমানত** জমা রাখা সম্পর্কে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ঘুষখোর বড় বড় অফিসাররা তাদের অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ বড় বড় ব্যাঙ্কগুলোতে বেনামীতে স্থায়ী আমানত হিসাবে রেখে দেয়। ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিরা সাধারণতঃ এই আমানতের আড়ালে সমপরিমান অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই ঋণ দ্বারা নতুন নতুন ব্যবসা বা শিল্পকারখানা আরম্ভ করে। বৎসরান্তে ব্যবসালব্ধ নিট মুনাফা থেকে এই ঋণের সুদ বাবদ একটা মোটা অংশ বাদ দেওয়া হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যবসায়ীরই হিসাবে শেষ পর্যন্ত জমা হয়। এভাবে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া টাকা দ্বারা নতুন নতুন ঋণের সৃষ্টি করে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়তে থাকে এবং ঋণের সুদ হিসাবে আবার লক্ষ লক্ষ টাকা নিজের পকেটেই ঢোকায়। ঘুষখোর অফিসারেরা ঘুষের টাকাটা আপাততঃ ব্যাঙ্কে বেনামীতে রেখে দেয়; পরে সুযোগ মত ঐ টাকা তুলে নিয়ে জমি, বাড়ি, বা গাড়ী কেনার মারফতেই খরচ করে। এযাবৎ ব্যাঙ্ক ব্যবসা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রয়েছে বলে ব্যাঙ্কের পরিচালকেরাও ডিপোজিটের লোভে এ সমস্ত লোকের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে এসেছে। যারা এসব ফন্দী জানতো না তাদেরও শিখিয়েছে। ব্যাঙ্কের এভাবে সহযোগিতার ফলেই সাবেক পাকিস্তানের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের করায়ত্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এভাবেই আদমজী পাকিস্তানে ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে ১৯৫০ সনে ব্যবসা আরম্ভ করে ২০ বৎসরে মালিক হয়েছেন ২৫০ কোটি টাকার ওপর। অতএব এখন যদি আইন করা যায় যে, কোন লোক যদি পাঁচ হাজার টাকার ওপর কোন অর্থ ব্যাংকে স্থায়ী আমানত রাখে তবে সেই লোকের নাম, ঠিকানা ও জমা দেওয়া অঙ্কের পরিমান সরকারের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীকে জানাতে হবে। ব্যাংকের নিকট থেকে এরূপ কোন জমার খবর পাওয়ার পর সেই কমিটি তদন্ত করে দেখবে উক্ত ব্যক্তি তার আয় অনুযায়ী উক্ত অর্থ জমা দিতে পারে কি-না। ব্যাংকের উপর

www.pathagar.com

এরূপ নির্দেশ থাকলে ধরা পড়ার ভয়ে কোন লোকই আর অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ ব্যাংকে রাখতে সাহস করবে না। এখন কোন লোক যদি এভাবে উপার্জিত অর্থ দিয়ে জমি, বাড়ি বা গাড়ী কিনতে না পারে বা ব্যাংকেও রাখতে না পারে তবে সে কি করবে? সমস্ত অর্থ ঘরে বা মাটির তলায় পুঁতে রাখবে? বাস্তব ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। অন্যায় ভাবে উপার্জিত অর্থ ভোগে লাগাতে না পারলে ওভাবে উপার্জনের প্রবণতাও মানুষের থাকবে না। সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটা ভালভাবেই প্রমানিত হয়ে গেছে। মোদ্দাকথা, **অন্যায়ভাবে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করার পথ বন্ধ করাই অন্যায়ভাবে উপার্জনের প্রবণতা বন্ধ করার প্রকৃষ্ট উপায়।**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে নানা পরিবর্তন এসেছে। যুদ্ধের বিপুল সরবরাহের যোগান দেওয়ার জন্য ঠিকাদারী ব্যবস্থায়ও (সাধারণতঃ যাকে কন্ট্রাক্টারী বলা হয়) দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এর পূর্বে ঠিকাদারী যারা করতেন তারা তাদের পেশাগত নীতি মেনে চলতেন। চাহিদার ও যোগানের পরিমান যেমন কম ছিল, প্রতিযোগীর সংখ্যাও তেমনি কম ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কোটি কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হয় ঠিকেদারদের। টাকার পরিমান যেহেতু অত্যধিক, ব্যক্তিগত লোভ-লালসার উর্দ্ধে ওঠাও তাই ঠিকাদারদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নতুন শিক্ষিত ব্যবসায়ীও এই ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। তারা কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য বিপুল পরিমান উৎকোচ, মদ এমন কি নারী সরবরাহেও পিছপা হয়নি। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার দরুণ তদন্ত ইত্যাদির প্রয়োজনও তেমন ছিলনা, ফলে অবাধে অসাধুতা এই ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করে। সাবেক পাকিস্তানী আমলে, এই বিষবৃক্ষ মহীরুহতে রূপান্তরিত হয়। একদিনে সম্ভব না হলে কন্ট্রাক্টারদের মারফৎ কাজ করাবার নীতি ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করে বিভাগীয় অফিসারদের তত্ত্বাবধানে মাইনে করা শ্রমিকদের মারফৎ রাস্তাঘাট ও গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। বড় বড় কাজগুলি ডিপার্টমেণ্টালী করা সম্ভব না হলে সমবায় ভিত্তিতে গঠিত ঠিকাদারী সংস্থার মারফৎ করা যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি-

www.pathagar.com

গত মালিকানা ভিত্তিক ঠিকাদার ফার্মকে (পার্টনারশীপই হউক বা লিমিটেড কোম্পানীই হউক) দিয়ে সরকারী বা আধাসরকারী বিভাগীয় কোন কাজই করান উচিত নয়। ব্যক্তিগত লাভালাভের কারণে মানুষ অনেক নীচে নামতে পারে। এই বিবেচনায় ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা ভিত্তিক ঠিকাদারী ব্যবসাকে সরকার উৎসাহ দিলে দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যাপারে অনেকটা সুফল পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রেও অসাধু ব্যবসায়ীরা এযাবৎ দেশ ও সরকারকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। পুঁজিবাদী অর্থ-নৈতিক কাঠামোর ছিদ্রপথে অবাধে এরা দুর্নীতির সম্পদ কুক্ষিগত করেছে। আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রেও সরকার যদি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত যৌথ সংস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করে, তাতে সুফল পাওয়া যাবে অনেক বেশি। দেশীয় কৃষিজাত দ্রব্য ও পণ্য রপ্তানি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানির ব্যাপারে সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ করে ও বাস্তবক্ষেত্রে তা সঠিক প্রয়োগ করে পুরোনো আমদানি রপ্তানি নীতির সংস্কার করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমদানি হ'ত বলেই সরকার অনেক ক্ষেত্রেই আণ্ডার ইনভয়েস-এর দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আবগারী বিভাগের সংশ্লিষ্ট লোকজনের সহায়তায় আইটেম বহি-র্ভূত পণ্য আমদানি করে সাবেক ব্যবসায়ীরা যেমন দুহাতে মুনাফা লুটেছে, সরকারকেও তেমনি-ভাবে ফাঁকি দিয়েছে। যৌথ মালিকানায় ব্যক্তি বিশেষের লাভের সম্ভাবনা না থাকায় বিপদের ঝুঁকি নিতে কম ব্যবসায়ী রাজী হবে। আমদানির ক্ষেত্রে যেমন ওভার ইনভয়েস-এর ঝুঁকি নেয়া হত, তেমনি রপ্তানির ক্ষেত্রেও আণ্ডার ইনভয়েসের কারবার চলতো। ফলে সরকার ও সমাজ অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হ'তো। এসব কারণে কৃষিজাত এবং কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের যৌথ মালিকানা সংস্থাগুলোকে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। তাহলেই বিদেশী পণ্যের মারফৎ অবৈধ বাড়তি আয়ের পথ রুদ্ধ হবে এবং সমাজ ও উপকৃত হবে।

www.pathagar.com

পূর্ণ সমাজতন্ত্রে একদিনে উত্তরণ সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে তাতে পৌঁছুতে হবে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বে সামাজিক পরিবেশ, সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও মানসিক বুনিয়াদ তৈরি করতে হয়। উপরোল্লিখিত অর্থনৈতিক বিধানগুলি এই সমাজতন্ত্রী পটভূমিকা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করবে বলে আমরা মনে করি।

www.pathagar.com

বর্তমান ব্যবসা পদ্ধতি, পুঁজিগঠন ও দেশের উন্নতি

[আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৯৭৮ সনের জুন মাসে লেখা হয়েছিল। প্রবন্ধে উল্লেখিত বিভিন্ন উপাত্ত পরিসংখ্যান ও বাজার দরগুলি তখনকার বাজার দর অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। গত সাত আট বৎসরে প্রবন্ধে উল্লেখিত মূল্যগুলি তিন চার গুণ বেড়ে গিয়েছে এবং শুল্কের পরিমাণেও কিছুটা রদ বদল হয়েছে। তাহলেও প্রবন্ধে উল্লেখিত মূল বক্তব্য এবং শোষণের ধারা ও কৌশল এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে।]

দেশীয় শিল্প কারখানায় প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যই হোক বা বিদেশ হতে আমদানীকৃত নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যই হোক এগুলিকে সুলভে বা ন্যায্যমূল্যে জনসাধারনের নিকট পৌঁছে দেবার দায়িত্ব হোল দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। জীবন ধারনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সহজলভ্যতার উপর এবং নিম্নতম জীবন ধারনের মান বজায় রাখার উপর দেশের সাধারণ মানুষের মানসিকতার সুসম বিকাশ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। মানুষের দৈনন্দিন নিম্নতম প্রয়োজনের চাহিদা মেটার উপর তার মানসিক শান্তি নির্ভর করে এবং এর উপর নির্ভর করে সাধারণ নাগরিকদের দেশপ্রেম ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ। তাই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ন্যায্যমূল্যে সর্বদা সরবরাহ করে যাওয়া শিল্প ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর একান্ত দায়িত্ব।

বাংলাদেশের শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রের অবস্থা একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যায় দেশের অধিকাংশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়

www.pathagar.com

এ দায়ীত্ব তো পালন করছেনই না; বরং যে পদ্ধতিতে এ দেশে শিল্প ও ব্যবসা চলছে তাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই মানুষের অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনের পরিবর্তে মারাত্মকভাবে মানুষকে শোষণ করে চলেছে। ফলে দেশের মানুষ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্রমাগত রক্তহীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় লোক অপরিমিত ধনের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। এটা ঘটছে শিল্পক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল অর্থনৈতিক নীতি অনুসরন করার ফলে। পাকিস্তানের প্রথম থেকেই এই ভুল শিল্পনীতির আরম্ভ এবং বাংলাদেশ হবার পরও সেই একই ভুলনীতি অনুসৃত হয়ে চলেছে।

দেশের শিল্প সংগঠন হয় দুই প্রকারের। এক প্রকারের শিল্প গড়ে উঠে দেশীয় কাঁচামালের উপর নির্ভর করে। এতে দেশীয় কাঁচামালকে শ্রমের মারফত শিল্পদ্রব্যে রূপান্তরিত করে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ বিদেশে রপ্তানির দ্বারা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে দেশে উৎপন্ন হয় না এমন সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি করা হয়। পরিচালনায় মারাত্মক ত্রুটি না ঘটলে এসব শিল্প সর্বদা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। পাটকল, কার্পেট, সিরামিক, কোল্ড স্টোরেজ, টেনারীজ, মুদ্রণ, হিমায়ীত মৎস্য ও চা শিল্প প্রভৃতি এই সব শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। আর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যাহা বিদেশী কাঁচামালের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান করা হয় দেশের সস্তা শ্রমের মারফত বিদেশী কাঁচামালের দ্বারা দেশের আপামর জনসাধারনের জন্য সস্তায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করার উদ্দ্যেশ্যে। এধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার সময় স্মরণ রাখতে হবে যেন এগুলি শ্রমপ্রধান হয়। অর্থ উৎপাদন খরচের শতকরা ৭০%/৮০% কিংবা নিদেন পক্ষে অন্ততঃ ৫০% যেন শ্রমাংশ হয়। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যগুলি আর্ন্তজাতিক মূল্যের চাইতে শতকরা ২৫/৩০ ভাগ অধিক মূল্যেও যদি জনসাধারনকে ক্রয় করতে হয় তাতে দেশের লোকের আর্থিক দিক থেকে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু যে শিল্পের গোটা উৎপাদন খরচের ৭০/৮০ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং শ্রমাংশ মাত্র ২০/২৫ ভাগ, দেশী শিল্প রক্ষার অজুহাতে সেই শিল্পের উৎপাদন আন্তর্জাতিক মূল্যের ৫০/৬০ ভাগ বা তদুর্দ্ধে দেশের জনগণকে কিনতে বাধ্য করলে সেই শিল্প

www.pathagar.com

জনগনের শোষনের মাধ্যমে শুধু শিল্প মালিকদেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় বর্তমানে বিদেশী কাঁচা-মালের উপর নির্ভরশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদিত দ্রব্যাদি জন-সাধারণকে একশত ভাগতো বটেই এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দুই/তিন গুণ অধিক মূল্যে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে ধনী অধিকতর ধনী এবং গরীব অধিকতর গরীব হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের আনুমানিক উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্য দেওয়া গেল। আন্তর্জাতিক মূল্যের চাইতে তুলনামূলকভাবে কত বেশী মূল্য জনসাধারণকে এ সব দ্রব্যের জন্য দিতে হচ্ছে এতে সেটা স্পষ্টভাবে আমরা বুঝতে পারবো। প্রথমে ধরা যাক ওয়ার ড্রইং ইণ্ডাষ্ট্রির কথা যারা ২২ গেজি গ্যালভ্যানাইজড তার তৈরী করে। এই তার সাধারণতঃ গ্রামের কৃষক ও গরীব লোকেরা ঘর তৈরী ও বেড়া বাঁধার কাজে ব্যবহার করে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণই এর আসল খরিদ্দার। কাঁচামাল হিসাবে দুই ইঞ্চি×দুই ইঞ্চি বিলেট হিসাবে এটা বিদেশ থেকে আসে। তারপর এটাকে ফারনেসে উত্তপ্ত করে টেনে প্রয়োজনীয় আকারে রূপান্তরিত করা হয়। এতে বিশেষ কোন কারিগরী জ্ঞানের দরকার হয় না। শ্রম শক্তির প্রয়োজনও অত্যন্ত সীমিত—শতকরা দশ ভাগেরও কম। এই বিলেটে প্রতি টনের আমদানি মূল্য সাধারণতঃ সাড়ে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে। এর ডিউটি ৩৫% এবং সেল ট্যাক্স ১৫%সহ প্রস্তুত খরচ সর্ব সাকল্যে নয় হাজার টাকার বেশী পড়ে না। কিন্তু বিক্রয় মূল্য প্রতি টন বিশ হাজার টাকার উর্দ্ধে। দেশে মোট দুইটি শিল্প প্রতিষ্ঠানই আছে যারা এই চিকন তার তৈরী করে। বার্ষিক মোট উৎপাদন বিশ হাজার টন। দুইটি কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা এক হাজারের নীচে। প্রস্তুত খরচ খুব বাড়িয়ে ধরলেও এই দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রতি টনে দশ হাজার টাকা করে বিশ হাজার টনে প্রতি বৎসর বিশ কোটি টাকা মুনাফা করে চলেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অদ্যাবধি এই আইটেমটি ওয়েজ আর্নার স্কীমে আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওয়েজ আর্নার স্কীমে আমদানি করলে এই তারের মূল্য প্রতি টন কোন অবস্থাতেই ১২ হাজার টাকার উর্দ্ধে পড়বে না।

এরপর আলোচনা করা যাক রিরোলিং শিল্পের কথা। এতে

www.pathagar.com

বিভিন্ন সাইজের এম, এস, রড তৈরী হয়। দালান কোঠা হতে আরম্ভ করে যে কোন আর, সি, সি, নির্মাণ কাজের জন্য এই জিনিষটি অপরিহার্য। এটিও বিদেশ হতে আসে বিলেট হিসাবে। পূর্বে উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় একে উত্তপ্ত করে লম্বা করা হয়। প্রতি টন বিলেটের আমদানি খরচ তিন হাজার টাকা। এরও ডিউটি ৩৫% এবং সেল ট্যাক্স ১৫%। লেবার, এক্সাইজ ডিউটি ও অন্যান্য আনুষংগিক খরচসহ উৎপাদন খরচ কোন অবস্থাতেই পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধে নয়, কিন্তু বিক্রয়মূল্য বর্তমানে প্রতি টন আট হাজার টাকা। এতে মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে শ্রমের অংশ প্রায় ১২%ভাগ। দেশে মোট রিরোলিং মিলের সংখ্যা প্রায় তিরিশটি যারা বৎসরে দুই লক্ষ টনের মত, এম, এস, রড তৈরী করে। টন প্রতি কম পক্ষে আড়াই হাজার টাকা মুনাফা ধরলেও এরা মিলিতভাবে প্রায় বৎসরে ৫০ কোটি টাকা মুনাফা করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উক্ত ত্রিশটি মিলের অধিকাংশই বিভিন্ন নামে আট দশ জন শিল্পপতির মালিকানাধীন। আহারের পরেই বাসস্থানের প্রশ্ন। গৃহাদী নির্মাণ কার্যের জন্য এ বর্ধিত মূল্যে রড কিনতে গিয়ে ধনী—নির্ধন নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। গৃহ নির্মাণের ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় বাড়ি ভাড়া ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও কম।

এরপর ড্রাইসেল ব্যাটারীর কথা আলোচনা করা যাক। দেশে পাঁচ/ছয়টি ড্রাইসেল ব্যাটারীর কারখানা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র দুইটি কারখানা ড্রাইসেল ব্যাটারী তৈরী করছে। এই ব্যাটারীও সাধারনতঃ গ্রামেই রেডিও ট্রানজিস্টার ও টর্চ লাইটের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত দুইটি কোম্পানী সর্বসাকল্যে তিন কোটির মত ব্যাটারী তৈরী করে থাকে যদিও দেশের বর্তমান চাহিদা প্রায় ছয় কোটির মত। এই শিল্পেরও সম্পূর্ণ কাঁচামাল বিদেশজাত। শ্রমিকের সংখ্যা অতি নগন্য। সব মিলিয়ে হাজারের মত। এদের দ্বারা প্রস্তুত ব্যাটারীর কোম্পানী নির্ধারিত মূল্য যদিও ৩·৪৫ টাকা কিন্তু বাজারে পাঁচ/ছয় টাকার কমে পাওয়া যায় না। ২৫০% ভাগ ডিউটি ও সেল ট্যাক্স দিয়েও বিদেশ থেকে এই ব্যাটারী আর্নার্স স্কীমে আমদানী

www.pathagar.com

করলে ১·৮৫ টাকার অধিক দাম পড়ে না। তাই দেখা যায় দেশবাসী প্রতি বছর ড্রাইসেল ব্যাটারীর জন্য প্রতি ব্যাটারীতে দুই টাকা করে ছয় কোটি ব্যাটারীর জন্য ১২ কোটি টাকা অতিরিক্ত দিয়ে যাচ্ছেন এমন একটি শিল্পকে, যাতে শ্রমের অংশ ১০% ভাগেরও কম।

এখন আমরা আলোচনা করবো মটর সাইকেল ও সাইকেল ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে। এ দুটো শিল্পই সংযোজন শিল্প। এর প্রতিটি অংশ নাট বোল্ট সহ টুকরা টুকরা ভাবে কাঁচামাল হিসাবে জাপান থেকে আমদানি করা হয়। দেশে মোট তিনটি সংযোজন শিল্প রয়েছে যারা বৎসরে মোট ১০ হাজার মটর সাইকেল সংযোজন করে। এই সংযোজনে কোনরূপ কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। মেশিনের মধ্যে প্রয়োজন হয় একটি স্ক্রু ড্রাইভার, একটি রেন্‌স ও একটি এস্‌পেনার। একজন দক্ষ শ্রমিক দিনে একটি মটর সাইকেল অবাধে সংযোজন করতে পারে। এই তিনটি কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা দুই শতেরও কম। আর্নার্স স্কীমের অধীনে ৩০% অতিরিক্ত প্রীমিয়াম, বর্ধিত হারে ডিউটি ও শুল্‌ক কর দিয়েও ৮০ সি, সির একটি পূর্ণাংগ মটর সাইকেল জাপান থেকে ছয় হাজার টাকায় আমদানি করা যায়। শিল্পের নামে সরকারী হারে বিদেশী মুদ্রায় আমদানীকৃত ও অনেক হ্রাসকৃত হারে ডিউটি ও সেল্‌স ট্যাক্‌স দিয়েও দেশে সংযোজিত ৮০ সি, সির একটি মটর সাইকেল মালিকরা বিক্রি করে ১৪ হাজার দুইশত টাকায়। অর্থাৎ ১০ হাজার মটর সাইকেলে এই তিনটি শিল্পের মালিকেরা বৎসরে কমপক্ষে আনুমানিক ৮/১০ কোটি টাকা মুনাফা করে যাচ্ছে। এতে শ্রমের অংশ উৎপাদন খরচের ১% এরও কম। বর্তমানে যানবাহন সংকটের যুগে মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তরা ধার কর্জ করেও একটি মটর সাইকেল কিনতে চায়। তাই এ শোষন মধ্যবিত্তদের জীবনে কত বড় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে এটা ভাববার বিষয়।

মটর সাইকেলের ন্যায় সাইকেল শিল্পের ইতিহাসও একই রকম। এটিরও শতকরা ১০০% ভাগ অংশ বিদেশ থেকে টুকরা টুকরা হিসাবে এসে এখানে সংযোজিত হয়। প্রয়োজনীয় সংযোজন হাতিয়ারও মটর সাইকেলের অনুরূপ। দেশে সাইকেলের কারখানার সংখ্যা ১০/১২টি, শ্রমিক সংখ্যা সর্বমোট হাজারের সামান্য বেশী। উৎপাদন খরচের মধ্যে শ্রমের অংশ ১৫% শতকের ন্যায়। ৩৩% বেশী প্রিমিয়াম

www.pathagar.com

এবং দেশী কারখানাগুলির চাইতে ২০% শুল্ক বিক্রয় কর অধিক দিয়েও ভারতের "হিরো" সাইকেল আর্নার্স স্কীমে এখানে এসে কিছুদিন পূর্বেও ছয়শত টাকায় বিক্রি হতো। আর সরকারী রেটে আমদানী করে এবং ২০% কম ডিউটি ও সেলট্যাক্স দিয়ে আমাদের দেশীয় শিল্পপতিরা তাদের প্রস্তুত সাইকেল নয়শত টাকার কমে বিক্রি করতে অপারগ। তাই তাদের স্বার্থরক্ষার্থে আমাদের সদাশয় সরকার বর্তমান বাজেটে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সাইকেল বা সাইকেল যন্ত্রাংশের শুল্ক ৩০% থেকে বাড়িয়ে ১০০% ভাগ করে দিয়েছেন। সংগে সংগে দেশী সাইকেলের মূল্য ৯০০/-(নয় শত) থেকে ১৩০০/-(তের শত) টাকায় উঠে গেছে এবং যে সাইকেল রিকসার প্রস্তুত খরচ তিন হাজার টাকা পড়তো তা এখন নয় থেকে দশ হাজার টাকা পড়বে বলে রিকসা ভাড়া এখনই দেড় টাকার যায়গায় দু'টাকা হয়ে গেছে। দেশের সাইকেল কারখানা-গুলি মোট প্রায় ১ (এক) লক্ষ সাইকেল তৈরী করে। এই ১ (এক) লক্ষ সাইকেলের জন্য দেশবাসীকে কত কোটি টাকা বেশী গুনতে হচ্ছে একটু হিসেব করলেই বুঝা যাবে।

গৃহ নির্মানের আর একটি অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান হলো জানালার কাঁচ যার ঘনত্ব হলো ৩ মিলিমিটার। বাড়ীঘর, অফিস, আদালতের জানালায় এই কাঁচ লাগানো হয়। বাংলাদেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান ওসমানীয়া সিট গ্লাস ফ্যাক্টরী এটি প্রস্তুত করে। এর কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রতি স্কোয়ার ফুট সাড়ে পাঁচ টাকা হলেও বাজারে ৮ টাকার কমে কোথায়ও পাওয়া যায় না। দেশে প্রস্তুত হয় এই অজুহাতে এর আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বাংলাদেশে বর্তমানে বৎসরে প্রয়োজনীয় আনুমানিক ৫০ লক্ষ স্কোয়ার ফুটে জনসাধারণকে ২ কোটি টাকা (প্রতি ফুটে ৪ টাকা হিসাবে) অধিক মূল্য দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। কোম্পানী যে দরে কাঁচামাল আমদানি করে তার চাইতে ৩০ ভাগ বেশী দিয়েও আমদানি করতে দিলে এর দাম ফুট প্রতি ৩ টাকার অধিক পড়ে না।

দেশবাসীকে শোষনের আর একটি বিরাট উৎস হচ্ছে চট্টগ্রাম ষ্টীল মিল। এখানে ঢেউ টিন, এম, এস, রডের জন্য বিলেট, দরজা জানালার জন্য এ্যাংগেল্স এবং বিভিন্ন শিল্পের জন্য এম, এস, প্লেট তৈরী হয়। অন্যান্য দ্রব্যগুলির উচ্চমূল্যের কথা বাদ দিলেও ঢেউ

www.pathagar.com

টিনের মারফত মিলটি প্রতি বৎসর গ্রামের মানুষকে কোটি কোটি টাকা শোষন করে যাচ্ছে। বাসস্থানের জন্য গ্রামে ঢেউ টিন একটি অপরিহার্য দ্রব্য। বিদেশ থেকে আমদানী করা ঢেউ টিন-এর মূল্যের চাইতে ষ্টীল মিলের মূল্য প্রতি টনে প্রায় ১,৫০০/০০ (দেড় হাজার) টাকা অধিক। উক্ত ষ্টীল মিল তার উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের মারফত দেশবাসীকে প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা শোষন করে নিচ্ছে। এখানে শ্রমিকের সংখ্যা চার হাজারের মত।

বাংলাদেশের মানুষ সব চাইতে শোষিত হচ্ছে বোধ হয় বি, টি, এম, সি, বা বস্ত্রকল সংস্থার মারফত। বাংলাদেশের আট কোটি লোক গড়ে যদি বৎসরে ১০ গজ কাপড় ব্যবহার করে তবে বৎসরে ৮০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়। তুলার উপরে যে শুল্ক রয়েছে সে শুল্ক হারে যদি বিদেশ থেকে কাপড় আমদানী করতে দেওয়া হয় তবে গজ প্রতি কমপক্ষে চার টাকা কমে আমদানী সম্ভব। তাই দেখা যায় দেশীয় মিলগুলির যার শ্রমিক সংখ্যা মাত্র ৫০,০০০ এদের স্বার্থে দেশবাসীকে কমপক্ষে বৎসরে ৩২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে। এই ৫০ হাজার শ্রমিককে বসিয়ে বসিয়ে ৩০০ টাকা করে মাইনে দিলেও বৎসরে ১৮ কোটি টাকার বেশী প্রয়োজন হয় না। পাকিস্তান যখন এক ছিল তুলা তখন আমাদের দেশীয় কাঁচামাল ছিল। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর তুলা এখন বিদেশী কাঁচামাল। তাই এর সংশ্লিষ্ট অর্থনীতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি আন্তর্জাতিক মূল্যের চাইতে বেশী মূল্যে ক্রমাগত ক্রয় করতে করতে বড় কৃষক তার সংবৎসরের উদ্‌বৃত্তটুকু হারিয়ে ফেলে মাঝারি কৃষকে পরিণত হচ্ছে। মাঝারি কৃষক উৎপাদিত শস্যের একটি মোটা অংশ দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য কিনতে গিয়ে ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। ছোট কৃষক যাদের ক্ষেতের ধানে পুরো ছয়মাস চলত এবং বাকী ছয়মাস জনমজুর খেটে সংসার চালাত এখন মহার্ঘ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে গিয়ে তার চাষের জমির কিছুটা করে প্রতিবৎসর বন্ধক দিতে দিতে কয়েক বৎসরে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় ভূমিহীন কৃষকের প্রতি বৎসর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে শিল্পের নামে এ সর্বগ্রাসী শোষনেরও একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

www.pathagar.com

শিল্পের পর দেশে ব্যবসা বাণিজ্য বর্তমানে কি ভাবে চলেছে সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক। শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রের অবস্থা প্রায় একই। ব্যবসায় উন্নতি করতে গেলে বর্তমানে দুর্নীতির কি পরিমাণ আশ্রয় নিতে হয় তা যারা ব্যবসা বাণিজ্যের সংগে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত আছেন তারা ব্যতীত অন্যদের পক্ষে পুরাপুরি জানা সম্ভব নয়।

বাহাত্তর তিয়াত্তরের লুটপাটের পর এমন বেশ কিছু লোকের ব্যবসা ক্ষেত্রে আগমন ঘটেছে, যথাশীঘ্র যত বেশী সম্ভব ধনসম্পদের মালিক হওয়াই যাদের একমাত্র লক্ষ্য। দেশ বা জনসাধারনের মঙ্গল অমঙ্গলের কোন প্রশ্নই তাদের নিকট বিবেচ্য নয়। মৌরসী ব্যবসায়ী বা সৎভাবে বিবেক অক্ষুন্ন রেখে যারা ব্যবসা করতে চায় দুর্নীতিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ফলে তারা কোথায়ও হালে পানি পাচ্ছে না। এদের মধ্যে অনেকেই হতাশ হয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছেন অথবা শেষ পর্য্যন্ত ভবিতব্যের কাছে আত্মসমর্পন করছেন। অল্প সময়ে ধনী হওয়ার একটা উন্মত্ত প্রতিযোগিতা চলছে। দেশে সর্বক্ষেত্রে মূল্যবোধের দারুন অবক্ষয় এ প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্রতর হতে সাহায্য করছে।

দুর্নীতির মারফত জনসাধারন বা সরকারকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জনের কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। যেমন ধরা যাক সরকার একটি সমুদ্রগামী পুরান জাহাজ স্ক্রাপ (SCRAP) হিসাবে বিক্রি করার জন্য দরপত্র আহ্বান করল। জাহাজটির আনুমানিক মূল্য হবে ৫০ লক্ষ টাকা। নিলাম হবে চট্রগ্রামে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো নিলাম ডাকার জন্য প্রার্থীদের দেড়শত টাকা করে টেণ্ডার ফরম কিনতে হবে। এখন নিলাম ডাকনেওয়ালাদের মধ্যে করিৎকর্মা দু'চারজন চট্রগ্রাম পৌঁছে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে খবর নিলেন কারা টেণ্ডার ফরম কিনেছে। তাদের ঠিকানা যোগাড় করে সবাই একত্রে বসে স্থির করলো যে ৫০ লাখের পরিবর্তে তারা ২০ লাখে এটাকে কিনবে। ওদের মধ্যে একজন বিশ লাখ টাকায় সর্বোচ্চ টেণ্ডার দাখিল করলো। বিশ লাখ টাকায় টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার পর সম্মিলিত নিলামদারেরা আবার নিজেদের মধ্যে সেটি নিলাম করলো। সর্বোচ্চ মূল্যে যে ডাকল জাহাজটি সে পেল, কিন্তু বিশ লাখের উপরে যে অংকটা উঠলো তা সবাই সমান ভাবে ভাগ করে নিল। বর্তমানে যত সরকারী নিলাম

www.pathagar.com

হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারই হচ্ছে। এমন বেশ কিছু নগদ অর্থের মালিক রয়েছেন যাদের ব্যবসাই হলো কোথায় বড় বড় নিলাম হচ্ছে তার খোঁজ রাখা এবং উপযুক্ত সময়ে হাজির হয়ে পারস্পরিক বুঝাপড়ার মারফত এক টাকার জিনিষ চার আনায় কিনে দেশ ও সরকারকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা। ছোট বড় সব সরকারী নিলামের ইতিহাস প্রায় একই প্রকার। অস্থাবর সম্পত্তি নিলামের ব্যাপারেই কিন্তু এটা ঘটে থাকে, স্থাবর বা শিল্প কারখানা নিলামের ব্যাপারে ঘটেনা এবং এটা সম্ভব নয়।

প্রথম শ্রেণীর বড় বড় কন্ট্রাক্টর হলেন তারা যারা পঁচিশ ত্রিশ বা তদুর্দ্ধে সি, এণ্ড, বি, বা অন্যান্য সরকারী বিভাগে টেণ্ডার দিতে পারেন। তাদের সংখ্যা মনে করুন কোন এক বিভাগে ২০ জন। এখন কোন একটি বিল্ডিং নির্মান কাজের উচিৎ মুনাফা সহ দর হওয়া উচিৎ ৫০ লাখ টাকা। সেখানে এই বিশজন মিলে স্থির করলো যে সর্বনিম্ন টেণ্ডার দেওয়া হবে ৭০ লাখ টাকা। টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার পর যিনি কাজটি পেলেন তিনি বাকী উন্নিশজনকে একলাখ করে বেয়ারার চেক দিয়ে দিলেন এবং দলের একজন হিসাবে নিজেও একলাখ টাকা ভাগে পেলেন। বাংলাদেশ সরকারের যেখানে যত বড় বড় কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, সেটা বিল্ডিংই হোক, রাস্তাঘাটই হোক বা বাঁধ তৈরীর কাজই হোক, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এ ব্যাপার পাকিস্তান আমল থেকেই চলে আসছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কন্ট্রাক্টারদের সংখ্যা অত্যধিক বিধায় এ প্রক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কার্য্যকরী হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ক্রমাগত প্রলোভন দেখিয়ে সৎ অফিসারদেরকেও দুর্নীতিপরায়ন করে তোলে। কোন অফিসারের হয়ত অর্থের প্রতি মোহ নাই। নারীর প্রতি খানিকটা দুর্বলতা আছে। ব্যবসায়ীরা অফিসারদের পিয়ন চাপরাসীর কাছ থেকে জেনে নেয় কার দুর্বলতা কোথায় এবং সুযোগ বুঝে সে জায়গায় আঘাত করে কাজ উদ্ধার করে নেয়।

আবার অনেক অসাধু অফিসার আছে যারা সৎব্যবসায়ীদেরকে সৎ থাকতে দেয় না। আভাস ইংগিতে বখরার কথা বুঝিয়ে দেয় এবং ব্যবসার খাতিরে সৎ ব্যবসায়ীকেও শেষ পর্য্যন্ত

www.pathagar.com

অফিসারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে বিবেক বিসর্জন দিতে হয়। আবার এমনও দেখা যায় আমদানি ক্ষেত্রে কোন ব্যবসায়ী বহু বৎসর ধরে চার পাঁচটি আইটেম বিদেশ থেকে আমদানি করে প্রত্যেক আইটেমের উপর একটা ন্যায়সঙ্গত মুনাফা করে সংসার চালিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখা গেল সরকার দেশে প্রস্তুত হচ্ছে এই অজুহাতে বা ভুল আমদানি নীতি গ্রহণ করে ঐ পাঁচটি আইটেমের চারিটিরই আমদানি বন্ধ করে দিলেন। তখন ঐ ব্যবসায়ীর পক্ষে একটি আইটেমের ন্যায়সঙ্গত আয়ে আর সংসার চালান সম্ভব হয় না বলে নানাভাবে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। আবার এমনও দেখা গেছে যে সরকার হঠাৎ মুদ্রামান কমিয়ে দেওয়ার ফলে বা হঠাৎ মারাত্মকভাবে শুল্ক বৃদ্ধির ফলে কোন কোন ব্যবসায়ী সমস্ত মূলধন হারিয়ে একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। তখন ভাগ্য পরিবর্তনের বা আত্মরক্ষার জন্য অনেক ব্যবসায়ীকে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের দ্বারা আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে সৎ ব্যবসায়ী বা বিবেকবান অফিসার দেশে একেবারেই নেই। এখনও দেশে এরূপ বেশ কিছু আছে। তবে নানা প্রতিকুল অবস্থার ফলে তাদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে।

সাপ্লাই বা ইণ্ডেন্টিং ব্যবসাতে একরকম দুর্নীতি চলে যাতে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটপাট হয়। প্রায় অফিসেই পারচেজ অফিসার বা কেরানীর সংগে একটি বিশেষ সাপ্লায়ারের বন্দোবস্ত থাকে। টেণ্ডার নোটিশে লেখা থাকলো টেণ্ডার দাতাকে কোন একটি জিনিষের প্রতি ডজনের দাম বা কোন জিনিষের প্রতি পাউণ্ডের দাম উল্লেখ করতে হবে। যার সংগে বন্দোবস্ত আছে সে ছাড়া অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয় না মোট সরবরাহের পরিমান কত। এক ডজন বা দশ পাউণ্ড হলে দাম যদি ১০০/০০ (একশত) টাকা হয় তবে ১০০ (একশত) ডজন বা কয়েক টন হলে স্বাভাবিকভাবেই দাম অনেক কম পড়বে। কেউ খোঁজ নিতে গেলে কোম্পানীর সত্যি-কারের প্রয়োজন কখনও বলা হয় না। ফলে নুতন লোকের পক্ষে টেণ্ডারে প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ইণ্ডেন্টিং ব্যবসাতেও প্রায় এই ব্যবস্থাই চলে। কোটি কোটি

www.pathagar.com

বা লক্ষ লক্ষ টাকার আন্তর্জাতিক টেণ্ডার যখন বের হয় তখন অনেক সময় যে জিনিষ ক্রয় করা হবে তার স্পেসিফিকেশনের সংগে এমন একটি বা দু'টি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় যা বিদেশে কোন একটি বিশেষ কোম্পানী তৈরী করে। ঐ বিশেষ স্পেসিফিকেশনটি এমন একটি সাধারণ ব্যাপার মেসিনটির গুনাগুন বা কার্য্যকারিতার সংগে মোটেও যার কোন সর্ম্পক নেই। শুধু যাতে বিশেষ কোন পার্টি অর্ডারটি পায় তাই ঐ ধরনের নিষ্প্রয়োজন শর্তটি স্পেসিফিকেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে ঐ জিনিষটির উৎকর্ষতা বা কার্য্যকারিতার ব্যাপারে সমমানের হলেও ঐ বিশেষ কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত জিনিষটি অন্য কোম্পানীর জিনিষের চাইতে কয়েক লক্ষ বা ক্ষেত্র বিশেষে কয়েক কোটি টাকা বেশী দিয়ে কিনতে হয়।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ মুদ্রণ শিল্প জগতে আর এক প্রকারের দুর্নীতি আরম্ভ হয়েছে ক্যালেণ্ডার ও ডাইরী মুদ্রণের ব্যাপারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান বা করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট অফিসারের সহিত কোন একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের একটা গোপন বন্দোবস্তের মারফত লক্ষ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করা হয়। এখানে লুন্ঠনের প্রক্রিয়াটি হয় দরপত্র আহ্বানের কারচুপির মারফত। দরপত্রে এমন কতগুলি শর্ত দেওয়া থাকে যা বিশেষ একটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়া সমশ্রেণীর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না। সাধারণতঃ ক্যালেণ্ডার ছাপা হয় ১১০ গ্রাম (plain) আর্ট পেপারে। বাজারে এর বেশী মোটা আর্ট পেপার কদাচিৎ প্রয়োজন হয় বলে উন্নতমানের ক্যালেণ্ডার ছাপার ক্ষমতা সম্পন্ন ছাপা খানার মালিকরা বিদেশ থেকে সাধারণতঃ ১১০ গ্রামের উপরের আর্ট পেপার আমদানী করে না। যে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বন্দোবস্ত আছে তার পরামর্শ অনুযায়ী দরপত্রে উল্লেখিত হল সাধারণ অর্থাৎ (plain) আর্ট পেপারের পরিবর্তে (Embossed) আর্ট পেপারে ক্যালেণ্ডার ছাপতে হবে। এমবস্‌ড আর্ট পেপার মুদ্রণ শিল্পে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় ব'লে কোন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই এই ধরনের কাগজ সাধারণতঃ ষ্টক করে না। দরপত্রে ঐ বিশেষ ধরনের কাগজ সরবরাহের শর্ত থাকার ফলে যোগ্যতা সম্পন্ন কোন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই সময়ের স্বল্পতা

www.pathagar.com

বশতঃ নতুন আমদানি সম্ভব নয় বিধায় টেণ্ডার দাখিল ক'রতে পারে না। ফলে যে ক্যালেণ্ডার প্রতি কপি ১০/১২ টাকার বেশী হওয়ার কথা নয় তাহাই ৪০/৫০ টাকায় ঐ বিশেষ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে অর্ডার দেওয়া হয়। এর ফলে দশ হাজার ক্যালেণ্ডারের দাম যেখানে এক লাখ বা সোয়া লাখ হওয়ার কথা তাহাই চার পাঁচ লাখ টাকায় খরিদ করা হয়। অতিরিক্ত যে মূল্য দেওয়া হয় তার একটা অংশ টেণ্ডার কমিটির কর্মকর্তাগন, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এমবস্‌ড আর্ট পেপার না থাকার ফলে যখন অন্যান্য মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম বৎসর প্রতিযোগিতা করতে অপারগ হ'ল তখন পরের বৎসর সবাই ঐ ধরনের ও ঐ গ্রামের কাগজ অমদানি করল। কিন্তু পরের বৎসর দরপত্র বাহির হওয়ার পর দেখা গেল এবার ১১০ গ্রামের পরিবর্তে ১২০ গ্রাম চাওয়া হয়েছে। এবারও সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। এবৎসরও প্রতিযোগিতায় অপারগ হয়ে যখন সব প্রতিষ্ঠানই ১২০ গ্রাম আমদানি করল তখন দেখা গেল পরবর্তী বৎসরে কাগজ চাওয়া হয়েছে ১৫০ গ্রাম। তার পরের বৎসর দেখা গেল কাগজ চাওয়া হয়েছে ১৮৫ গ্রাম যা পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে ব্যবহৃত হয় না। এতদব্যতীত আরও দুই ধরনের কৌশলের মারফত অন্যান্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা হতে দূরে রাখা হয়। প্রথমটি হ'ল মুদ্রণের জন্য এত অল্প সময় দেওয়া হয় যা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু যে প্রেসটির সংগে বন্দোবস্ত থাকে তারা অর্ডার পাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা বিধায় বহু পূর্বেই কাজ আরম্ভ ক'রে দেয়। ফলে দরপত্রে উল্লেখিত স্বল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ ক'রতে তাদের কোনই অসুবিধা হয় না। এছাড়া কখনও দেখা যায় ক্যালেণ্ডারের সাইজ এমন অদ্ভুত মাপের দেওয়া হয় যা ডবল ক্রাউন বা ডবল ডিমাই সাইজের কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড (Standard) কাগজ হ'তে আসে না। শুধু ঐ বিশেষ প্রেসটি পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ঐ (Non-standard) কাগজটি আমদানি করে রাখে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের নিরাপদ দুরত্বে রাখার আর একটি কৌশল যে ছবি ছাপা হবে তার বিষয়বস্তু (Theme) প্রেসের কাছে চাওয়া। মুদ্রণ জগতে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হ'ল খরিদ্দার ছাপার বিষয়বস্তু বা ছবি (Transparency) সরবরাহ ক'রবে। ছাপা খানার কাজ হ'ল শুধু ছেপে দেয়া। কিন্তু

www.pathagar.com

অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে হালে কয়েক বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশন ছাপার জন্য বিষয়বস্তু সম্বলিত ছবি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকেই সরবরাহ ক'রতে হবে বলে দরপত্রে উল্লেখ করছেন যা সাধারণতঃ প্রোফেশনাল ফটোগ্রাফারের কাজ। ফলে অনুগৃহিত প্রেসটি ছাড়া অন্য কারও সরবরাহকৃত ছবি বা (Transparency) গৃহীত হয় না। উপরোক্ত কৌশলগুলির মাধ্যমে দেখা যায় বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও করপোরেশনগুলির ক্যালেণ্ডার ছাপার কাজ ঢাকার বিশেষ একটি প্রেস ক্রমান্বয়ে কুক্ষিগত করে ফেলছে, আট-দশ বৎসর পূর্বে মুদ্রণ শিল্প জগতে যাদের কোনও নামই ছিল না। ওয়াকেফহাল মহলের ধারনা এই প্রক্রিয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ হওয়ার পর গত ছয় বৎসরে কমপক্ষে ৭০/৮০ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেছে।

সাম্প্রতিক কালে আর এক ধরনের ব্যবসা আরম্ভ হয়েছে যা সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধ গতির ব্যাপারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলেছে। এর ফলে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিষেরই দাম স্থিতিশীল থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা শহরে ১৯৭২ সনের পর প্রধানতঃ সুতা, লবন ও চাউলের কারবারের মারফত এমন বেশ কিছু ভুঁইফোড় ব্যবসায়ীর জন্ম হয়েছে যাদের প্রত্যেকের কাছে ৫০/৬০ লক্ষ থেকে ক্ষেত্র বিশেষ কোটি টাকারও উপর নগদ অর্থ জমা হয়ে গেছে। এরাই বর্তমানে আমদানি করা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, চাঁদপুর, ভৈরব বাজার, মীরকাদিম প্রভৃতি বড় বড় মোকামে কোন জিনিষের ষ্টক বর্তমানে কত আছে এটা তারা লোক পাঠিয়ে হিসাব নিয়ে নেয়। যখন দেখা গেল গত ছয় মাসে বা এক বৎসরে যত মাল আমদানি হয়েছিল তার ৬০/৭০ ভাগ খরচ হয়ে গেছে এবং উক্ত দ্রব্যটি বৎসরাধিক কাল ধরে প্রচুর আমদানি হওয়ায় বহু আমদানিকারক লোকসান দিয়েছে, ফলে গত তিন চার মাসে আর কেহই ঐ বিশেষ দ্রব্যটির জন্য কোন ঋণপত্র খোলেনি। তখন এরা বাজারে যে ৩০/৪০ ভাগ মাল এখনও রয়েছে যা ধীরে ধীরে বিক্রি হলে দাম তেমন বাড়ত না, সেই দ্রব্যটি ঐ কয়জন ব্যবসায়ী সমস্ত মোকাম থেকে কিনে গুদামজাত করে ফেলে। ফলে রাতারাতি দ্রব্যটির দাম বেড়ে যায়। এভাবে হঠাৎ যথেষ্ট দাম বাড়তে দেখলে অবশ্য অনেক

www.pathagar.com

আমদানিকারকই তাড়াতাড়ি আবার ঋণপত্র খোলেন। কিন্তু ঋণপত্র খোলার পরেও বাজারে নতুন মালের আমদানি হতে কম পক্ষে চার পাঁচ মাস সময় লেগে যায়। যারা নগদ টাকায় কিনে সমস্ত মাল স্টক করেছিল এই তিন চার মাসের ব্যবধানে তারা প্রচুর মুনাফা লুটে নেয়। মোটা রকমের নগদ অর্থের মালিক কিছু লোকের এই ধরনের গুদামজাত করার মারাত্মক প্রবণতার ফলে জন জীবনে নেমে আসে অসীম দুঃখ দুর্দ্দশা। এটা বন্ধ করতে হলে পর পর কয়েক-বার হঠাৎ করে ডিমনিটাইজেশন (Demonetisation) করে বাজার থেকে কালো টাকা ছেঁকে তুলে নিতে হবে। আর মুনাফাখোরী ও কালোবাজারির জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে হবে। কালো বাজারি ও মুনাফাখোরীর জন্য জেল বা জরিমানা কোন প্রতিরোধকই (Deterrent) নয়। কারণ অন্যায়ভাবে উপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকার একটা সামান্য অংশ ব্যয় করলেই জেলখানায় রাজার হালে থাকা যায় এবং প্রতি-দিন জেলে বসে ৫৫৫ নং সিগারেট ও স্কচ হুইস্কি পেতে কোন রকমের অসুবিধা হয় না। দু'চার মাস জেল খেটে আসার পর বাড়ি গাড়ী থাকলে, পাড়ার ছেলেদের ক্লাবগুলিতে বা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে একটা মোটা রকমের চাঁদা দিলেই লুপ্ত সামাজিক মর্যাদা ফিরে পেতে কোন অসুবিধা হয় না। তাই অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে লুটপাট বন্ধের ব্যাপারে জেল বা জরিমানা কোন প্রতিবন্ধক বা প্রতি-রোধকই নয়। একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই এ-প্রবণতাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে। কারণ অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ নিজে ভোগ করতে না পারলে ছেলে মেয়ের ভোগের জন্য কেউ এ ঝুঁকি নিতে চায় না, ধরা পড়লে আমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে এবং আমার ছেলে মেয়েরা সে অর্থ ভোগ করবে, আমি ভোগ করতে পারব না, এরূপ পরিস্থিতিতে কালো বাজারীর প্রবণতা আর থাকে না। অর্থাৎ অসৎভাবে উপার্জিত অর্থ নিজের জীবনে ভোগ করতে না দেওয়াই হলো অসৎ উপায়ে উপার্জনের প্রবণতা বন্ধ করার শ্রেষ্ঠতম উপায়। চীন, রাশিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে কালোবাজারি বন্ধ করা এভাবেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের দেশে যতদিন এ ব্যবস্থা গৃহীত না হচ্ছে ততদিন কঠোর শাস্তি ও জেলের হুশিয়ারী যতই দেখান হোক না কেন কোন কাজেই আসবে না।

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত শিল্প সংস্থাগুলোর মারফত যে অর্থ গ্রামাঞ্চল বা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শোষন করে শিল্পের নামে শহরবাসী কতিপয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বা ঠিকাদারী, সাপ্লাই ও বিভিন্ন ব্যবসার নামে দেশব্যাপী যে শোষন চলেছে তার ক্রমাগত ফল দাড়াচ্ছে এই যে, গ্রামের মানুষের আর্থিক বুনিয়াদ শক্ত করার সর্ব প্রকার সাধু প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। কৃষিঋণ বা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের মারফত যত অর্থই গ্রামাঞ্চলে পাম্প করা হচ্ছে তা শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন শোষনের মারফত শহরেই ফিরে আসছে। তাতে সরকারের গ্রামের উন্নতির সব পরিকল্পনাই শেষ পর্য্যন্ত ভেস্তে যাচ্ছে। এর ফলে দেশে পুঁজি সংগঠনও দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দেশে পুঁজি সংগঠিত হয় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের আয়ের যে উদ্বৃত্ত অংশটুকু তারা ব্যাংকে বা পোষ্ট অফিসে জমা রাখে প্রধানতঃ তার উপর নির্ভর করে। গত কয়েক বৎসর এই শ্রেনীর লোকদের মাসান্তে উদ্বৃত্ত থাকা ত দূরের কথা প্রতি মাসেই তাদের ধার করতে হয়। গত পনর বৎসরে ব্যাংক ও পোষ্ট অফিসে যে টাকা তারা রেখেছিল তাও উঠিয়ে শেষ করে খেয়েছে। লাইফ ইনসুরেন্স এর মারফতও মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের উদ্বৃত্ত আয়ের একটা মোটা অংশ দেশের পুঁজি সংগঠনের কাজে লাগে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে হাজার টাকার নীচের মাহিনায় সরকারী কর্মচারিদের মধ্যে ইনসুরেন্স করার ক্ষমতা বা প্রবণতা খুবই কমে গেছে। লাইফ ইনসুরেন্স সাধারণতঃ সরকারী কর্মচারিরাই করে থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রসার খুব সীমাবদ্ধ।

উপরোক্ত কারণগুলির ফলে দেশের অভ্যন্তরে পুঁজি সংগঠন দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অধিকাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বাংলা-দেশ ব্যাংক থেকে ক্রমাগত ধার করে চলেছে। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকও রিজার্ভ ফাণ্ডের সংগে সংগতি না রেখে নোট ছেপে ছেপে সরকারের ক্রমবর্ধমান খরচ মিটিয়ে চলেছে। দেশী শিল্পপতিদের মুনাফার একটা বিরাট অংশ হুণ্ডির মারফত দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সর্ম্পকে অনেক শিল্পপতিরই মনে ভয় আছে বলে তাদের মুনাফার একটা বিরাট অংশ দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে দেশে পুঁজির অভাব ক্রমাগত বাড়ছে।

www.pathagar.com

দেশের সত্যিকারের উন্নতি হচ্ছে না। উন্নয়ন কর্মসূচীর নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও ভুল অর্থনীতি ও প্রোগ্রামের ফলে সত্যিকারের কোন উন্নতি দেশে হচ্ছে না। শুধু অফিসের পর অফিস খোলা হচ্ছে। কিন্তু এটা দেশের সত্যিকারের উন্নতি নয়।

দেশের জনসাধারণের সত্যিকারের উন্নতি করতে হলে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বহুলোকের কর্ম সংস্থান হয় এবং বিদেশে পুঁজি পাচার বন্ধ হয়। যে সমস্ত শিল্প মোটেই শ্রম প্রধান নয় বরং দেশের মঙ্গলের পরিবর্তে জনসাধারণকে শোষন করে চলেছে সেগুলি প্রয়োজনবোধে বন্ধ করে দিতে হবে। বিদেশী কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল শিল্প গঠন ভবিষ্যতে যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে। এ ধরনের শিল্পমালিকের যাতে তাদের প্রস্তুত দ্রব্যের ইচ্ছামত দাম বাড়াতে না পারে তজ্জন্য দেশে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যের শিল্পপতিদের জন্য উপযুক্ত শুল্ক হারের মারফত প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ সাপেক্ষে আর্নার্স স্কীমের অধীনে আমদানি করতে দিতে হবে। কৃষি ও কুটির শিল্পের বহুল প্রসার ঘটাতে হবে। যে সব প্রক্রিয়ায় দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হয় তা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। দেশে এমন সব শিল্প গড়ে তুলতে হবে যা কুটির শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হবে। তবেই দেশ সত্যিকারের উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ভ্রান্ত শিল্প নীতি ও বেকার সমস্যা

[আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৯৭৮ সনের জুলাই মাসে লেখা হয়েছিল। প্রবন্ধে উল্লেখিত বিভিন্ন উপাত্ত ও বাজার দরগুলি তখনকার বাজার দর অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। গত সাত আট বৎসরে প্রবন্ধে উল্লেখিত মূল্যগুলি চার পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়েছে এবং শুল্কের পরিমাণেও কিছুটা রদ বদল হয়েছে। তাহলেও প্রবন্ধে উল্লেখিত মূল বক্তব্য এবং শোষণের ধারা ও কৌশল এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে।]

যদিও সব দেশে শিল্প গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদেশ থেকে আমদানি না করে দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি নিজেদের প্রস্তুতের মারফৎ বিদেশী মুদ্রা বাঁচান এবং সম্ভব হ'লে দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকলে তা বাইরে রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা আয় করা, তথাপি শিল্প গঠনের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের জনশক্তির একটা বিরাট অংশের জন্য কর্ম-সংস্থান করা। কৃষি প্রধান দেশে যদিও দেশের শ্রম শক্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত হয় কৃষি ও তৎজাত উৎপাদিত দ্রব্যের বন্টন ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, তথাপি একটা বিরাট অংশের কর্ম-সংস্থানের জন্য প্রয়োজন হয় দেশে শিল্প গঠনের। কৃষি প্রধান দেশে এই শিল্পের রূপ হয় সাধারণতঃ কুটির শিল্পের আকারে।

যে দেশে জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমান কম, খনিজদ্রব্যের পরিমানও সীমিত, উন্নত কারিগরি জ্ঞানেরও অভাব রয়েছে, সে দেশে শিল্প গঠনের সময় মনে রাখতে হবে শিল্প কারখানা-গুলি যেন পুঁজিপ্রধান না হয়ে শ্রমপ্রধান হয়। পুঁজিপ্রধান শিল্প গঠন সে দেশেই সম্ভব যে দেশে শ্রম শক্তির অভাব রয়েছে, খনিজ সম্পদে দেশটি প্রচুর সম্পদশালী এবং কারিগরি জ্ঞানের দিক থেকে দেশটি যথেষ্ট উন্নত, যেমন পশ্চিম জার্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স ও বৃটেন প্রভৃতি দেশ। কিন্তু যে সব দেশে জনসংখ্যা অত্যধিক, কারি-

www.pathagar.com

গরিজ্ঞান সীমিত সে সব দেশে শিল্প সংগঠন সাধারণতঃ শ্রমভিত্তিক হতে হয়। এই নীতি অনুসৃত হতে দেখি আমরা চীন, ভারত প্রভৃতি জনবহুল দেশে।

বাংলাদেশ ভারত ও চীনের মত একটি জনবহুল দেশ যেখানে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের একটি ভূখণ্ডের মধ্যে ন' কোটি লোকের বাস, যেখানে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা প্রায় ষোল শত, যেখানে প্রতি বৎসর ক্রমবর্দ্ধমান বেকারের কর্ম-সংস্থানের একমাত্র পথ যতদূর সম্ভব পুঁজি প্রধান (capital intensive) শিল্প পরিহার করে শ্রম প্রধান (labour intensive) শিল্প গঠন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে কয়েক বৎসর যাবৎ যে শিল্প নীতি অনুসৃত হচ্ছে তা সর্বদাই পুঁজি প্রধান,শ্রমপ্রধান মোটেই নয়। এই ভ্রান্ত নীতি আমাদের অর্থনীতিকে ক্রমাগত একটা বিরাট বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু লোকের কর্ম্ম-সংস্থান হচ্ছে খুবই কম। এর ফলে যারা শিল্প সংগঠন করছে মূলতঃ তাদেরই লাভ হচ্ছে, অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে তারা মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে, দেশের সমস্ত সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে এসে জমা হচ্ছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান না হওয়ায় দেশের সত্যিকারের কোন মঙ্গল হচ্ছে না। বিদেশ থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া অর্থে পুঁজি প্রধান শিল্প গঠনের ফলশ্রুতি হিসেবে দেশের মাথার উপর ক্রমাগত ঋণের বোঝা বাড়ছে যার ডেট্‌সার্ভিসিং এর পরিমান প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে। আমাদের রপ্তানি আয় বর্তমানে বৎসরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। এর একটা বিরাট অংশ প্রতি বৎসর সুদ সহ বিদেশী ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যয়ের পরিমান প্রতি বৎসরই বাড়ছে। কয়েক বৎসর পর দেখা যাবে যে আমাদের আয়ের অর্ধেকের উপরে চলে যাচ্ছে বিদেশী ঋণ পরিশোধে। তখন দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে, প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলি চালু রাখার জন্য কাঁচামাল আমদানি করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ দেশ দেউলিয়া হয়ে পড়বে। পুঁজিপ্রধান শিল্প গঠনের ফলে এ সব শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ও শিল্পের জন্য মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে করতে প্রতি বৎসর আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ফাঁক

www.pathagar.com

মারাত্মক রকম বেড়ে যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১৯৭২ সনে আমাদের রপ্তানি ছিল আনুমানিক আড়াইশত কোটি টাকা, আমদানি ছিল প্রায় সাতশত কোটি টাকা। গত কয়েক বৎসর রপ্তানি যে হারে বেড়েছে আমদানি বেড়েছে তার চাইতে দ্বিগুনেরও বেশী হারে। বর্তমানে আমাদের রপ্তানি বৎসরে প্রায় সাড়ে সাত শত কোটি টাকা, কিন্তু আমদানি আড়াই হাজার কোটি টাকার উপরে। আমদানি ও রপ্তানির এই ফাঁক যে ভাবে বেড়ে চলেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া দেশের ভবিষ্যত অর্থনীতির উপর কি মারাত্মক হবে তা ভাবলে দিশে-হারা হতে হয়। যে মারাত্মক ভুল নীতির উপর ভিত্তি করে সরকারী বেসরকারী খাতে শিল্প সংগঠিত হচ্ছে তাতে কোন কালে যে আমদানি ও রপ্তানি অংকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে তা মনে হয় না। বর্তমান ব্যবস্থায় দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঋণদাতা দেশ সমূহের দাসে পরিণত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। শিল্প ক্ষেত্রে বর্তমানে অনুসৃত নীতি যে কিরূপ মারাত্মক রকমের পুঁজি প্রধান, সম্প্রতি অনুমতি প্রাপ্ত কয়েকটি শিল্পের জন্য অনুমোদিত পুঁজি এবং তাতে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সংখ্যা পর্য্যালোচনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার খবরে প্রকাশ বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ৯৪টি শিল্প প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে তাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় মোট অর্থের প্রয়োজন হবে ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। এতে শ্রমিকের প্রয়োজন হবে মাত্র ২৭৩ জন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা থেকে স্কীম পাশ করাবার সময় শিল্প প্রকল্পের প্রয়োজনীয় শ্রমিকের সংখ্যা যা দেখান হয় বাস্তব ক্ষেত্রে তার চাইতে অনেক কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। তবুও শিল্প ব্যাংকের সম্প্রতি অনুমোদিত ১৪টি শিল্পে যদি ধরে নেওয়া যায় যে সত্যই ২৭৩ জন শ্রমিকের কর্ম সংস্থান হবে, তথাপি হিসাব করলে দেখা যায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার প্রয়োজন হচ্ছে একজন শ্রমিকের কর্ম-সংস্থানের জন্য। দেশে প্রতি বৎসর ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে বৎসরে অন্ততঃ ৮/১০ লক্ষ লোক বয়সপ্রাপ্ত হচ্ছে যাদের জন্য কর্ম-সংস্থান করতে হবে। এর মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে যদি অন্ততঃ দু'লাখ লোকের জন্য কর্ম-সংস্থান করতে হয় জন প্রতি আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করে

www.pathagar.com

তবে প্রতি বৎসর আমাদের প্রয়োজন হবে পাঁচ হাজার কোটি টাকার মত যা আমাদের ন্যায় গরীব দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই শিল্প ক্ষেত্রে এই মারাত্মক পুঁজি প্রধান শিল্প গঠন নীতি আমাদের পরিহার করতে হবে। গত কয়েক বৎসরে যে কয়টি সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে দেখা গেছে একই ভুল নীতির অনুসরণ। গত বৎসর বরিশালে ২৫ হাজার টাকুর সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় মোট সাড়ে বার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সে মিলে শ্রমিকের প্রয়োজন হবে প্রতি শিফ্‌টে মাত্র ৪০০, দুই শিফ্‌টে মোট ৮০০ জন। এক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রতিজন শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান-এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ টাকা। গত কয়েক বৎসর যাবৎ যতগুলি শিল্পের অনুমোদন বিভিন্ন ঋণদান সংস্থা দিয়েছেন হিসেব করলে দেখা যায়। সবগুলি প্রায় পুঁজিনির্ভর এবং মূল চরিত্র একই প্রকারের।

এখানে উল্লেখযোগ্য এই ভুল নীতি যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে অনুসৃত হচ্ছে তা নয়। এটা আরম্ভ হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। বাংলাদেশ হওয়ার পরও আওয়ামী-লীগ সরকার এবং তার পরবর্তী সরকারও একই ভুল নীতি অনুসরন করে চলেছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শিল্প ক্ষেত্রে এই ভুল নীতির আদি প্রবক্তা হচ্ছে পশ্চিমারা যাদের অধিকাংশই দিল্লী, কানপুর, গুজরাট, বোম্বে প্রভৃতি এলাকা থেকে পাকিস্তানে হিজরত করছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশেরই দেশপ্রেমের বালাই ছিল না। একমাত্র কাম্য ছিল মুনাফা, তা যে প্রকারেই হোক। শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের শিল্পের জটিল অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে অধিকাংশের কোন সুষ্ঠু জ্ঞান ছিল না। ঐ সব শিল্প উদ্দোক্তারা যে ভাবে বুঝিয়েছে সে ভাবেই শিল্প নীতির মূল কাঠামো তৈরী হয়েছে। কোথায়ও বুঝে কোথায়ও না বুঝে অফিসারেরা বিদেশী কাঁচামাল ভিত্তিক পুঁজি প্রধান এমন সব শিল্প স্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন এবং দেশী শিল্পকে প্রোটেকসন দেওয়ার নামে এমন সব নীতি অনুসরন করে আসছেন যার ফলে দেশের আপামর জন-সাধারণের মঙ্গলের পরিবর্তে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু তাদের মালিকদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েছে এবং দেশের অধিকাংশ ধনসম্পদ শিল্প এবং ব্যবসার নামে মুষ্টিমেয়

www.pathagar.com

লোকের হাতে জমা হয়েছে। ঐ সমস্ত কলকারখানায় প্রস্তুত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি উচ্চমূল্যে কিনতে দেশের সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়ে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে।

এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে চীন ও ভারতের মত জনবহুল দেশে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমপ্রধান কুটির শিল্প স্থাপনের যে নীতি, সে সব দেশের সরকার গ্রহণ করেছে আমাদেরও সেই নীতিই গ্রহণ করতে হবে। চীন সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলেও যতদূর জানতে পেরেছি বিপ্লবের পর থেকেই দেশের বিপুল জনশক্তিকে যাতে কাজে লাগান যায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থেকে শিল্প সংগঠন পর্যন্ত সব কাজেই এমন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চীন সরকার রাস্তা ঘাট তৈরী করা থেকে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব অটোমেশনকে পরিহার করেছেন। রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য বুলডোজার প্রভৃতি ব্যবহার না করে শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। এতবড় দেশের হাজার হাজার ছাপাখানাতে অটোমেটিক মেশিনের ব্যবহার যতদূর সম্ভব পরিহার করে হাতে কাগজ লাগান মেশিন ব্যবহার করে আসছে। এমন কি অফসেট মেশিনের ন্যায় উন্নতমানের ও আধুনিক ধরনের ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিনও তারা অটোমেটিক না করে হ্যান্ড ফেড (Hand fed) করে তৈরী করেছে। এ ধরনের বেশ কয়েকটি মেশিন ষাট দশকের প্রথম ভাগে ঢাকায় বিভিন্ন মুদ্রণালয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে গুলি এখনও বেশ ভাল ভাবেই চলছে। যতদূর জানা যায় চীন বর্তমানে অটোমেটিক মুদ্রণ যন্ত্র তৈরী করলেও তা শুধু বিদেশে রপ্তানি করার জন্যই করছে। নিজের দেশে এখনও সে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর জনশক্তির কর্ম্ম-সংস্থানের জন্য যতদূর সম্ভব হাতে চালান মেশিন ব্যবহার করে চলেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে বিক্রির জন্য যেখানে স্বয়ংক্রিয় ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন হয় শুধু সে ক্ষেত্রেই অটোমেটিক মেশিন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়।

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ক্ষুদ্র শিল্প মেলাতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে ও কলিকাতার বিভিন্ন শিল্প এলাকা ঘুরে দেখলাম। দেশের আভ্যন্তরীন চাহিদা মেটাবার জন্য শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে তারাও যতদূর সম্ভব অটোমেশান পরিহার করে অধি-

www.pathagar.com

কতর জনশক্তিকে ব্যবহার করার নীতি গ্রহণ করেছে। এতে এক-দিকে যেমন বিদ্যুৎ শক্তির সাশ্রয় হচ্ছে, তেল মবিল বেঁচে যাচ্ছে, তেমনি সফেসটিকেটেড অটোমেটিক মেশিনের মূল্যবান যন্ত্রাংশের খরচ থেকেও বেঁচে যাচ্ছে। কলিকাতার বরাহনগরের একটি দিয়াশলাই কার-খানায় দেখলাম মাত্র ছোট ছোট দু'টি মেশিন চলছে। একটি মেশিন দিয়াশলাই-এর উপরের ও ভিতরের বাকসের জন্য কাঠের পাতলা ফলক সাইজ মত কেটে দিচ্ছে। অন্য একটি মেশিনে ম্যাচের কাঠি কেটে দেওয়া হচ্ছে। এরপর ঐ পাতলা কাঠের ফলক ও কাঠি পার্শ্ববর্তী গ্রামের ও বস্তির লোকেরা থলি ভরে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছে। সে সংগে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে ম্যাচ বাকসের উপরের নীল কাগজের এক একটি করে রীল, কিছু আঠা ও কয়েকটি করে কাঠের ফ্রেম। ঘরে বসে অবসর সময় ছেলে, মেয়ে ও বউঝীরা ঐ পাতলা কাঠের পাত বা ফলককে মুড়ে আঠার সাহায্যে কাগজ লাগিয়ে দিয়াশলাইর উপরের খোলা ও ভিতরের কাঠি রাখার বাক্স বানিয়ে ফেলছে, ফ্রেমের মধ্যে স্তরে স্তরে কাঠিগুলোকে আটকিয়ে নিচ্ছে এবং পরের দিন আবার বাক্স ও ফ্রেম সহ কারখানায় ফিরে এসে ঐ ফ্রেমকে মশলার মধ্যে চাপা দিয়ে কাঠির আগায় বারুদ লাগানোর কাজ শেষ করছে। এরপর ফ্রেম খুলে কাঠিগুলোকে বাক্সের মধ্যে পুরে কারখানায় ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বুঝিয়ে দিয়ে মজুরি নিয়ে যাচ্ছে। এ সব কাজের জন্য গ্রোস হিসাবে নিম্নহারে মজুরি দেওয়া হয়। বাক্স তৈরীর মজুরি প্রতি গ্রোস ২০ পয়সা, কাঠের ফ্রেমে কাঠি আটা প্রতি গ্রোস ২৫ পয়সা, বাক্সে কাঠি ভর্ত্তি প্রতি গ্রোস ২০ পয়সা। যেহেতু দিয়াশলাই শিল্পে আবগারী শুল্ক আছে তাই মশলা লাগানও প্যাকিংএর কাজটি একটি কেন্দ্রীয় স্থান থেকে সম্পন্ন হয়। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল একটি আট দশ বৎসরের ছেলে বা মেয়ে কাজ করতে করতে যখন দক্ষতা অর্জ্জন করে তখন গড়ে আট ঘন্টায় ছয় থেকে সাত গ্রোস বাক্স তৈরী করতে পারে এবং দশ থেকে বারটি ফ্রেমে কাঠি আটতে পারে। এতে বাড়ীতে বসে দেড় টাকা থেকে দু'টাকা আয় করতে পারে। বাড়ীতে ভাইবোন বাপ মা মিলে অবসর সময় এরা গড়ে দশ বার টাকা আয় করে। এখানে মনে রাখতে হবে ভারতীয় মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা আমাদের মুদ্রার প্রায় দ্বিগুন, তাই উপরোক্ত আয় নেহাৎ কম নয়।

www.pathagar.com

ঐ কারখানায় অটোমেটিক মেশিনও দেখলাম যাতে পাতলা কাঠের ফালিকে আপনা আপনি মুড়ে আঠা লাগিয়ে নীল কাগজে মুড়ে বাইরের খোলা ও ভিতরের বাক্‌স তৈরী করা চলে। কাঠিগুলিও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মসলা যুক্ত হয়ে বাক্‌সের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অধিক লোকের কর্ম্ম-সংস্থানের জন্য সরকার ঐ অটোমেটিক মেশিনগুলিকে বন্ধ করে দিয়েছে। বাক্‌স বানান ও মসলা লাগান, বাক্‌সে কাঠি ভরা সব কাজই হাতে করছে। এর ফলে যেমন অধিক লোকের কর্ম-সংস্থান হচ্ছে তেমনি উৎপাদন খরচও কম হচ্ছে। ভারতের বিখ্যাত উইমকো ম্যাচ কোম্পানীর দিয়াশলাই বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৫ পয়সা করে আর এরা বিক্রি করছে ১২ পয়সা করে। খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ কমিশন যারা এ কারখানা পরিচালনা করছে বললেন যে প্রতিযোগিতায় তারা উইমকো কোম্পানীকে ক্রমে ক্রমে বাজার থেকে হটিয়ে দিচ্ছেন এবং সস্তা বলে তাঁদের দিয়াশলাইয়ের চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। কয়েকটি বাক্‌স খুলে পরীক্ষা করে দেখলাম। কোন বাক্‌সে একটিও মসল্লাহীন বা ভাংগা কাঠি নেই। প্রত্যেকটি কাঠি নিখুঁত। কর্তৃপক্ষ বললেন সমগ্র ভারতবর্ষে বর্তমানে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে ম্যাচ বাক্‌স তৈরীর মারফৎ প্রায় দুই লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান করেছেন এবং এ সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

কুটির শিল্পের মধ্যে আর একটি শিল্প হচ্ছে চরকা শিল্প। দেশের বিরাট জন সমষ্টিকে কাজে লাগিয়ে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে এর ভূমিকা অপরিসীম। ভারতবর্ষে অম্বর চরকা ও মসলীন চরকার দ্বারা প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান করা হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হয় না। হাতে ঘুরিয়েই এই চরকা চালান যায়। দুই টাকু হতে ছয় টাকুর অম্বর ও মসলীন চরকার বিপুল প্রচলন করা হয়েছে সে দেশে। অম্বর চরকায় ৪৪ কাউন্ট থেকে ৮০ কাউন্ট ও মসলীন চরকায় ১৫০ কাউন্ট থেকে ৩৫০ কাউন্ট পর্য্যন্ত অত্যন্ত মিহি সুতা তৈরী করা চলে। নদীয়া জেলায় এই মসলীন চরকার দ্বারা যে সূক্ষ্ম সুতা তৈরী হচ্ছে তার দ্বারা মলমল ও অতি ফাইন আদ্দি তৈরী হচ্ছে। এসবই হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের উদ্যোগে। এই সব মসলীন চরকার দ্বারা একজন যুবক কর্মী ভারতীয় মুদ্রায়

www.pathagar.com

দৈনিক ৫/৬ টাকা উপার্জন করে। এর জন্য অবশ্য এক ইঞ্চি থেকে সোয়া ইঞ্চি আঁশযুক্ত উন্নতমানের তুলা প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এক কোটির উপর বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলা রয়েছে অম্বর ও মসলীন চরকার মারফৎ যাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ থেকে ৩০ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থান করা চলে। এটা দেশের বৃহত্তম কুটির শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটা বিরাট ভূমিকা নিতে পারে। ২৫ লক্ষ লোক চরকায় যে পরিমান সুতা উৎপাদন করতে পারে তা দিয়ে আমাদের দেশে বৎসরে ৮০ কোটি গজ কাপড়ের জন্য আনুমানিক যে ১৪ কোটি পাউণ্ড সুতার প্রয়োজন হয় তা মিটিয়েও সমপরিমান সুতা বিদেশে রপ্তানী করে ১২০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। বর্তমানে ২৫,০০০ টাকুর একটা সুতা কল বসাতে দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রায় প্রায় ১২'৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। এই টাকার দ্বারা দুই টাকুর ৪৪ হাজার অম্বর চরকা তৈরী করা যায়। সাড়ে বার কোটি টাকার সুতাকলে প্রতি শিফ্‌টে কর্মীর প্রয়োজন হয় ৪ শত এবং ঐ টাকায় ৪৪ হাজার অম্বর চরকায় কর্ম-সংস্থান হয় ৪৪ হাজার লোকের। চার টাকু ও ছয় টাকুর অম্বর চরকার হিসেবে কর্মীর প্রয়োজন হয় যথাক্রমে ২২ হাজার ও সাড়ে চৌদ্দ হাজার। উৎপাদন হিসেব করলেও দেখা যায় ২৫ হাজার টাকুর একটি মিলের দৈনিক উৎপাদনের চাইতে ৪৪ হাজার অম্বর চরকার উৎপাদন কমত নয়ই বরং কিছুটা বেশী। এ সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্য চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ত্যাগী মনোভাব সম্পন্ন হাজার হাজার নিষ্ঠাবান কর্মী ও দেশ প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ সত্যিকারের জনগনের সরকার। সরকারী কর্মচারীর মারফৎ যে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্থির হয় সে দেশে এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আধুনিক সুতাকলের পরিবর্তে চরকার মারফৎ কর্ম-সংস্থানের প্রস্তাব অনেকের নিকটই অবাস্তব ও পশ্চাদমুখী মনোভাবের পরিচায়ক বলে মনে হবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করার পরিবর্তে মান্ধাতার আমলের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ বলে।

একে অনেকে হয়ত সমালোচনা করবেন। কিন্তু এরূপ সমালোচনার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান,

www.pathagar.com

জার্মানী প্রভৃতি দেশ আমাদের ন্যায় জনসংখ্যা পীড়িত দেশ নয়। তাদের ভৌগোলিক আয়তন ও শিক্ষিতের হার আমাদের চাইতে অনেক বেশী, জনসংখ্যা আবার অনেক কম। তাই তাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচী আর আমাদের কর্মসূচী এক হতে পারে না। যতক্ষন দেশে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি মোটামুটি গড়ে না উঠছে ততক্ষন বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য অত্যাধুনিক প্রথা পরিহার করে কিছুটা পুরাতন পদ্ধতিরই অনুসরণ আমাদের করতে হবে।

বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে অধিক লোকের কর্ম-সংস্থান ও বৃহৎ শিল্পে কাঁচামাল আমদানী ও আনুষঙ্গিক সমস্যাদি দূর করার এক প্রচেষ্টা দেখলাম ভারতে চিনি শিল্পের ক্ষেত্রে। দৈনিক একশত অথবা তদুর্দ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সুগার মিল তৈরী করার পরিবর্তে ভারত সরকার দৈনিক ৬ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মিনি সুগার মিল তৈরী করছে। এগুলোকে আখ উৎপাদন এলাকায় বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার কাজ হলো দুই বা তিন মাইলের মধ্যে যে সমস্ত ক্ষেতে আখ উৎপাদিত হচ্ছে তার দ্বারা চিনি তৈরী করে দেওয়া। এতে সুবিধা এই রাস্তাঘাট বা যানবাহনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। যানবাহন পাওয়া না গেলেও কৃষকেরা মাথায় করে আখ এনে এসব মিলে সরবরাহ করতে পারে। এতে যানবাহনের প্রয়োজন হয় না বলে উৎপাদন খরচ কম হয়। আমাদের দেশে উত্তর বঙ্গে বৃহৎ আকারের যে সব মিল আছে সেগুলিতে ২৫/৩০ মাইল দূর থেকে আখ আনতে হয় বলে রাস্তাঘাটের অসুবিধা ও যানবাহনের অভাবে প্রায়ই ক্ষেতের আখ ক্ষেতে শুকায়। আখের রস অনেক কমে যায় বলে শেষ পর্য্যন্ত চিনির উৎপাদনও অনেক কম হয়। এতে কৃষক ও দেশ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এরূপ মিনি সুগার মিল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিলে এক দিকে চিনি শিল্পের বহু সমস্যা দূর হয়ে জাতীয় উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে অপর দিকে বর্তমানের চাইতে অনেক অধিক সংখ্যক লোকেরও কর্ম সংস্থান হতে পারে। অর্থের দিক থেকেও মিনি সুগার মিল প্রতিষ্ঠায় খরচ অনেক কম। বর্তমানে দৈনিক ১০০ শত টনের একটি সুগার মিলের যন্ত্রপাতি কিনতে কমপক্ষে ১০ কোটি টাকা লাগে। আর একটি মিনি সুগার মিলের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ৬ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায়

www.pathagar.com

প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। ১০০ শত টন ক্যাপাসিটির একটি চিনিকলের জন্য সমপরিমান চিনি উৎপাদনের জন্য প্রায় ৩২ টি মিনি সুগার মিল বসাতে হবে। এর জন্য বৈদেশিক মূদ্রার প্রয়োজন হবে ১০ কোটির জায়গায় মাত্র সাড়ে তিন কোটি। এব্যাপারটা আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভাল ভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের আওতায় আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হলো হাতে তৈরী কাগজের কারখানা যার বেশ কয়টি ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের বিরাটিতে এমনি একটি কারখানা রয়েছে যাতে দৈনিক ২৫ থেকে ৩০ রিম কাগজ উৎপন্ন হয়। এসব কাগজ সাধারণতঃ খুব দামী কাগজ যা দিয়ে সার্টিফিকেট, নিমন্ত্রণ পত্র, বইয়ের কভার ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। এগুলি একটু মোটা। এর দ্বারা দেওয়াল ঢাকার কাজও খুব সুন্দর ভাবে চলে, বিদেশে যাকে ওয়াল পেপার বলে। বিরাটিতে যে কারখানা দেখলাম তাতে প্রতি শিফটে ১৪ জন করে দুই শিফটে ২৮ জন লোক কাজ করে।

কাঁচামালের মধ্যে ঘাস, কলাগাছ ও কলাপাতা, যে কোন ধরনের আঁশযুক্ত গাছের পাতা ও খানিকটা করে ন্যাকড়া, গেঞ্জির ছাট বা পুরান কাপড়ের টুকরা। এই কারখানায় মাত্র তিনটি মেশিন ও একটি হাউজের মারফৎ কাগজ তৈরী হয়। প্রথমে একটি বিটিং মেশিনে ঘাস, কলাপাতা ও ন্যাকড়া প্রভৃতি উপাদানগুলি পানি ও ক্যামিকেলের সাহায্যে পিশে নরম করে মণ্ডের আকারে একটি চৌবাচ্চাতে ফেলা হয়। তারপর চৌবাচ্চা থেকে ছাকনির সাহায্যে এক এক সীট করে কাগজ তৈরী করে একটা প্রেস মেশিনের সাহায্যে উদ্বৃত্ত পানিটা বের করে দিয়ে সীটগুলিকে টাঙিয়ে দিয়ে শুকান হয়। তারপর সে গুলিকে একটা ক্যালেণ্ডারিং মেশিনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দিয়ে মসৃন করে নেওয়া হয়। এই তিনটি মেশিনের দাম ভারতীয় মূদ্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের মূদ্রায় বড় জোর এক লক্ষ টাকা। এক লক্ষ টাকায় যদি ১৪ জনের কর্মসংস্থান হয় তবে জনপ্রতি পড়ল সাত হাজার টাকা। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিল্পনীতি চলছে তাতে জনপ্রতি কর্ম-সংস্থানের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা। সে দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে আমাদের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করাটা সরকারের উচিৎ বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

দেশের বিপুল জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের একমাত্র পথ হলো এমন সব শিল্প স্থাপন করা যাতে বিদেশী কাঁচামালের প্রয়োজন অত্যন্ত স্বল্প কিন্তু জন শক্তির প্রয়োজন হয় খুব বেশী একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। যেহেতু আমাদের দেশে ভারত বা জাপানের ন্যায় কারিগরি জ্ঞান নেই, বড় বড় ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠেনি, পুঁজিরও অত্যন্ত অভাব তাই জাপান, ভারত বা দক্ষিন কোরিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় যতোটা সম্ভব ভারী ও মাঝারী শিল্প গড়ে তুলে লোকের কর্ম—সংস্থান সম্ভব নয়। চট্রগ্রাম ষ্টীল মিলে তৈরী ইস্পাতের টন প্রতি যে দাম পড়ে তা দিয়ে আর্থিক দিক থেকে লাভজনক কোন ভারী বা মাঝারী শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই অনেক ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন ও ঘড়ি প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পের কথা উল্লেখ করা চলে, যাতে কাঁচামালের অংশ সর্বসাকুল্যে দশ পনর ভাগের বেশী নয়, বাকীটা শ্রমাংশ। এর চাহিদা সমাজ জীবনে অত্যন্ত বেশী এবং এর জন্য প্রতি বৎসর আমাদের কয়েক কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। একটি এক ব্যান্ডের রেডিও বা একটি টেলিভিশনের জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় যথাক্রমে একশত টাকা ও তিন হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু তাতে যে পরিমান লোহা, পিতল, তামা, দস্তা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় তার দাম খুব বেশী করে ধরলেও রেডিওর ক্ষেত্রে ২০/২৫ টাকা এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ৭০০ টাকার বেশী নয়। বাকী হচ্ছে কারিগরিজ্ঞান ও শ্রমের মূল্য। জয়দেবপুরে যে অতি আধুনিক মেশিন টুল্‌স ফ্যাক্‌টরী বসান হয়েছে তা দিয়ে এর অধিকাংশ পার্টস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরী করা চলে। বাকী গুলির জন্য আরও কিছু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে যা বিদেশ থেকে ক্রয় করা অসম্ভব নয়। ঘড়ির ক্ষেত্রেও এ কথাটা প্রযোজ্য। এতে কাঁচামাল অর্থাৎ ষ্টীল, পিতল, প্রভৃতির পরিমান অতি নগন্য, মোট মূল্যের এক পঞ্চমাংশের বেশী নয়। বাকীটা সম্পূর্ণ শ্রমাংশ। এগুলি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মারফৎ দেশে তৈরীর প্রচেষ্টা নিলে বিদেশে রপ্তানির কথা বাদ দিয়ে শুধু দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্য যে পরিমান উৎপাদনের প্রয়োজন হবে তাতেও সামান্য বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে বহু হাজার শ্রমিকের কর্ম—সংস্থান হবে। বাংগালীর মেধা বা প্রতিভা অন্য কোন দেশের লোকের তুলনায় কম নয়। শুধু উপযুক্ত পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও পরিবেশের ফলে এ মেধাকে কাজে লাগান

www.pathagar.com

যাচ্ছে না। সম্প্রতি বিদেশী প্রকৌশলীদের সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশীরা বিভিন্ন স্থানে যে সব অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি মেরামত কার্য্য সম্পন্ন করেছে বলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খবর বের হয়েছে, এতেই বাংগালীদের প্রতিভার প্রমান পাওয়া যায়। রেডিও, টেলিভিশন ও ঘড়ি প্রভৃতির জন্য বড় বড় কারখানার প্রয়োজন হয় না। একটি বা দু'টি শিল্প কারখানা থেকে এর পার্টস গুলি তৈরী করে নেওয়া যায়। পরে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে ঘরে ঘরে দক্ষ অর্ধদক্ষ নারী পুরুষ মিলে এ সমস্ত পার্টস বা অংশগুলিকে সংযোজন করে একটি বা দু'টি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সরবরাহ করা হবে যারা সংযোজিত দ্রব্য গুলোর মান পরীক্ষার পর বাজারজাত করবে। প্রথম প্রথম হয়ত মোটা বা সাধারণ অংশ-গুলিই এখানে তৈরী সম্ভব হবে। অতি সূক্ষ্ম অংশগুলি, যেমন রেডিওর ক্ষেত্রে কনডেনসার, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে পিকচার টিউব এবং ঘড়ির ক্ষেত্রে হেয়ার স্প্রীং, পীভট ও ব্যালেন্স ষ্টাফ প্রভৃতি বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে। কালক্রমে দক্ষতা অর্জন করতে করতে সব গুলিই শেষ পর্য্যন্ত দেশে তৈরী করা সম্ভব হবে। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর কয়েক হাজার দেওয়াল ও টেবিল ঘড়ি বিদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে। এর বিশেষ কোন অংশ সূক্ষ্ম নয়। এর সবগুলিই ইচ্ছা করলে প্রথম থেকেই দেশে তৈরী করা চলে।

আমাদের দেশে মোটর সাইকেল, সাইকেল প্রভৃতি কয়েকটি সংযোজন শিল্প রয়েছে যেগুলিতে শতকরা ৮০ ভাগই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৯৫ ভাগই বিদেশী কাঁচামালের অংশ, বাকী টুকু শ্রমের অংশ। সমস্ত শিল্প স্থাপনের অনুমতি নেওয়ার সময় শিল্পপতিরা শিল্প মন্ত্রণালয়ে যে স্কীম দাখিল করেছিল তাতে প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সংযোজনের মারফত ধীরে ধীরে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করে ক্রমান্বয়ে সমস্ত অংশই দেশে তৈরী করবে। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে সংযোজন শিল্প গুলির কোনটিই গত দশ বার বৎসরে বিপুল পরিমান মুনাফা করলেও কোন অংশই দেশে তৈরী করার কোন উদ্যোগ নেয়নি এবং সরকারের শিল্প বিভাগও এ ব্যাপারে কোন তদন্ত করা বা পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

সমগ্র বাংলাদেশে গত দুই বৎসরে বেশ কয়টি টেলিভিশন

www.pathagar.com

ও রেডিও এসেমব্লিং প্লান্টের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যারা শতকরা একশত ভাগ অংশই বিদেশ থেকে আমদানি করে এখানে সংযোজন করে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবে। এ সমস্ত শিল্প সংস্থাপকরা অনুমতি নেওয়ার সময় যদিও সরকারকে ক্রমান্বয়ে অধিকাংশ অংশই স্থানীয় ভাবে তৈরী করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কার্যক্ষেত্রে এ প্রতিশ্রুতি কতটুকু রক্ষা করবে বলা শক্ত, কারণ বিদেশ থেকে সমস্ত অংশগুলি এনে অতি সহজে সংযোজন করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করতে পারলে দেশে পার্টস তৈরী করার উদ্যোগ, পরিশ্রম ও ঝামেলায় কে যেতে চায়?

এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারত, চীন প্রভৃতি জনবহুল দেশ, যেখানে টেলিভিশন চালু করতে গেলে লক্ষ লক্ষ টেলিভিশনের প্রয়োজন হয় এবং বিদেশ থেকে আমদানী করতে গেলে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হয়, এরা কেউই টেলিভিশনের শতকরা একশত ভাগ অংশ যতক্ষন নিজেরা তৈরী না করতে পেরেছে ততক্ষন পর্য্যন্ত নিজের দেশে টেলিভিশন চালু করেনি। আমাদের দেশে অর্থাৎ তদানীন্তন পাকিস্তানে টেলিভিশন চালু করা হয়েছে ১৯৬৪ সনে যদিও টেলিভিশনের একটি অংশও তখন পাকিস্তানে তৈরী হতো না। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত যারা তখনও আমাদের চাইতে শিল্পের দিক থেকে অনেক বেশী উন্নত ছিল, তারা কিন্তু ১৯৭৭ সালের পূর্বে অর্থাৎ টেলি-ভিশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের শতকরা একশত ভাগ নিজেরা তৈরী করার ক্ষমতা অর্জনের পূর্বে, টেলিভিশন চালু করেনি যদিও সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এই প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা আমাদের চাইতে কম ওয়াকেফহাল ছিল না। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন মহকুমা ও থানা হেড কোয়ার্টারে বিদ্যুতায়নের ফলে দেশে হাজার হাজার সেট টেলিভিশন বসতে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি সেটের মূল্য গড়ে বিদেশী মুদ্রায় কম করে তিন হাজার টাকা করে ধরলেও আগামী কয়েক বৎসরে কয় শত কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা ব্যয় এবং এগুলিকে চালু রাখতে গিয়ে প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ আমদানী করতে যাচ্ছি এবং সে সংগে আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে অর্থনীতির দিক থেকে

www.pathagar.com

এ বিলাসীতা আদৌ উচিৎ কিনা এটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। যদি টেলিভিশনের শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগ জিনিষ দেশে স্বল্প মূল্যে স্বল্প শ্রমে তৈরী হতো তা'হলে এত চিন্তার কারণ ছিল না। আমাদের মনে রাখতে হবে চীন আমাদের চাইতে আর্থিক ও শিল্পের দিক থেকে বহু উন্নত হওয়া সত্বেও এখনও ঘরে ঘরে টেলিভিশনের কথা কল্পনাও করেনি। শুধু শ্রমিকদের ক্লাব, কমিউন ও পাবলিক প্লেস ছাড়া টেলিভিশনের অস্তিত্ব প্রায় কোথায়ও নেই। তাই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যতদিন না আমরা সম্পূর্ণ অথবা অধিকাংশ অংশ নিজের দেশে তৈরী করতে না পারছি ততদিন এ ধরনের ব্যয়বহুল বিদেশী মুদ্রার উপর নির্ভরশীল শিল্প স্থাপনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে দেশের অর্থনীতিবিদদের চিন্তা করবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

বড় শিল্প ছোট শিল্পকে গ্রাস করে ফেলার প্রবণতাকে সাফল্য-জনক ভাবে রোধ করার একটা বাস্তব পদক্ষেপ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত সরকার টেলিভিশন শিল্পের বিকেন্দ্রীকরনের মারফতে নিয়েছে দেখতে পেলাম। হিজ মাস্টার্স ভয়েস, ফিলিপ্স ও মার্ফি এই তিনটি কোম্পানীকে টেলিভিশনের পার্টস তৈয়ার করার অনুমতি ভারত সরকার দিয়েছে কিন্তু সেগুলিকে সংযোজন করে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন তৈরী করার অনুমতি দেয় নাই। তাদের তৈরী পার্টসগুলি ছোট ছোট অনেক কোম্পানী ও সমবায় প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়ে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে টেলিভিশন তৈরী করে নিজেদের কোম্পানীর নামে বাজারজাত করে চলেছে। উপরোক্ত তিনটি কোম্পানীকে টেলি-ভিশন তৈরীর অনুমতি দিলে তারা ছোট কোম্পানীগুলিকে কোন দিন নিয়মিতভাবে পার্টস সাপ্লাই দিত না। ফলে ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে সংযোজনের মারফৎ যে ভাবে বহুসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এটা হতো না। এছাড়া অনেকগুলো সংযোজন কোম্পানী গড়ে উঠায় প্রতিযোগিতায় দামও অনেক কমে গেছে। দেশের লোক সস্তায় টেলিভিশন কিনতে পারছে। একটি ২৪" টেলিভিশনের দাম সেখানে আড়াই হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের টাকায় চার হাজার। যে তিনটি কোম্পানী পার্টস তৈরী করছে তারা যদি সংযোজন করবার অধিকার পেত তবে এ শিল্পে কর্ম-

www.pathagar.com

সংস্থানই যে শুধু কম হতো তা নয়, দেশের লোককে প্রতি সেটের জন্য কমপক্ষে ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকা বেশী দিতে হতো।

আমাদের এদেশেও একটি শিল্পের উল্লেখ করা যায় সেটি হলো ড্রাইসেল ব্যাটারী শিল্প, যে শিল্পে মাত্র দু'টি কোম্পানী চান্দা ও হক ব্রাদার্স সমস্ত বাজার কুক্ষিগত করে রেখেছে। এরা প্রয়োজনীয় পার্টসের মধ্যে একটা খুব দরকারী পার্ট অন্যদেরকে সরবরাহ করবে এ আশায় আরও সাত আটটি কোম্পানী ড্রাইসেল ব্যাটারী তৈরীর জন্য ছোট ছোট কারখানা করেছিল। এই পার্টটি হচ্ছে ড্রাইসেল ব্যাটারীর জিঙ্ককক্যান (Zinc Can) বা জিঙ্কের তৈরী খোল। এটা জিঙ্ক ইনগোট্স (Zinc ingots) থেকে অতি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পাওয়ার প্রেস দ্বারা তৈরী করা হয়। এই মেশিনটির দাম পূর্বেও প্রায় চার পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল। এখন এর দাম প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মত। তাই জিঙ্কের খোল তৈরী করার জন্য এত উচ্চ মূল্যের পাওয়ার প্রেসটি না কিনে ছোট ছোট কোম্পানী গুলো চান্দা ও হক কোম্পানী থেকে খোলের সরবরাহ পাবে এই আশায় ছোট ছোট কারখানা বসিয়েছিল। এই শিল্পে কাঁচামালের মধ্যে খোলটাই হলো আসল, বাকী অংশ গুলো লাগাবার জন্য বিশেষ কোন সুক্ষ্ম বা ভারী মেশিনের প্রয়োজন পড়ে না। ক্যামিক্যালস হতে অন্যান্য সব জিনিষগুলিই বাজারে পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায় প্রথম দিকে খোল সরবরাহের আশ্বাস দিলেও এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুদিন সরবরাহ দেওয়া হয়ে থাকলেও নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ঐ বৃহৎ দু'টি কোম্পানী খোল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় ঐ সব ছোট ছোট কোম্পানীগুলি সবই বন্ধ হয়ে গেছে। চান্দা ও হকের পুরান ব্যাটারীর খোল ব্যবহার করে অবশ্য কেউ কেউ নূতন ব্যাটারী বানিয়ে বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। এক্ষেত্রে সরকার যদি এমন একটি কোম্পানী গঠন করেন যাদের কাজ হবে শুধু ব্যাটারীর খোল তৈরী করে দেওয়া আর অন্যরা সে খোল কিনে নিয়ে ঘরে বসে ব্যাটারী বানাবে, তবে বর্তমানে এ শিল্পে যে পরিমান লোক খাটছে তার চতুর্গুণ লোকের কর্ম-সংস্থান করা সম্ভব, প্রতিযোগিতায় দামও অনেক কমে যেতে বাধ্য। যেখানে বাজারে দু'টি মাত্র প্রস্তুতকারক,

www.pathagar.com

ফলে জনসাধারণকে ১০/১২ টাকা একজোড়া ব্যাটারীর জন্য দিতে হচ্ছে, অথচ ৫/৬ টাকায় এক জোড়া ব্যাটারী অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে যারাই খানিকটা চিন্তা ভাবনা করেন তাঁদের অধিকাংশের মত হলো দেশকে বাঁচাতে, ধনসম্পদ মুষ্টিমেয়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়া বন্ধ করতে, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের নামে শহর কর্তৃক গ্রামকে অব্যাহত শোষন বন্ধ করতে এবং ক্রমবর্দ্ধমান বেকারের জন্য কর্ম-সংস্থান করতে হলে, আমাদের দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিল্পনীতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে হবে ----- এ ছাড়া অন্য কোন পথই নেই।

www.pathagar.com

পাটশিল্প

জাতীয়করণ ও সমাজতন্ত্র

মার্চ, ১৯৭৯

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষি ভিত্তিক। মোট জাতীয় আয়ের ৭০ ভাগ আসে কৃষি থেকে বাকী ৩০ ভাগ আসে শিল্পজাত উৎপাদন থেকে। তাই কৃষিই হলো আমাদের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। এবং কৃষির মধ্যে পাটই হলো বিদেশী মুদ্রা অর্জনের সর্ব প্রধান পণ্য, সেটা কাঁচা পাটই হোক বা পাটজাত দ্রব্যই হোক। তাই বলা যায় দেশের সমগ্র অর্থনীতি পাটের উৎপাদন ও উপযুক্ত মূল্যে রপ্তানীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটির ভবিষ্যৎ আমাদের অযোগ্যতা ও ভুল অর্থনীতি অনুসরনের ফলে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছে। সোনালী আঁশ আজ কৃষকের আশা আকাঙ্খার প্রতীক না হয়ে গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় পরিবার পরিজনের কাপড় চোপড় হতে আরম্ভ করে সংসারের প্রয়োজনের একটা বিরাট অংশ যে কৃষক পাট বিক্রি করে মেটাত সে কৃষক আজ পাট বিক্রি করে উৎপাদন খরচটাও উঠাতে পারছে না। পাটের উৎপাদন খরচ ধানের চাইতে বেশী। তাই একমন পাট বেচে দু' মন ধান অথবা তার সমতুল্য না পেলে পাট চাষ, চাষীর পক্ষে মোটেই লাভজনক হয় না।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে একমন পাট বেঁচে মোটামুটি পরার যোগ্য একখানা শাড়ী কেনা সম্ভব হচ্ছে না। পাট বিক্রি হচ্ছে মন প্রতি ৪০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষক এদরও পাচ্ছে না। ফলে কোথাও কোথাও দারিদ্র-পীড়িত ঋণগ্রস্ত কৃষক চরম দুঃখে পাটে আগুন দিচ্ছে কোথাও আবার পেটের জ্বালায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে পাট নিয়ে পূর্বে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংগে গর্ব করতাম; বাংলাদেশ হওয়ার পর তার উৎপাদনও ক্রয়

www.pathagar.com

বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আজ চরম সংকট দেখা দিয়েছে। এই সংকটের প্রধান কারণ পাটের মত নাজুক ও স্পর্শকাতর বস্তুর আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে যে মারাত্মক জটিলতা রয়েছে তার সম্বন্ধে আদৌ জ্ঞান না থাকার ফলে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার এমন এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছেন যা আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতিতে ক্রমাগত বিপর্য্যয় ডেকে এনেছে। এই সমস্ত পদক্ষেপ গুলির মধ্যে প্রধান হলো পাট শিল্প ও পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করা। এই জাতীয়করণের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে মনে হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার সংগে সংগে একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে পশ্চিমা শিল্প গোষ্ঠীর দেশ ত্যাগ ও নানাবিধ প্রতি-কুল অবস্থায় এমন কতগুলি জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক অব-স্থার উদভব হয়েছিল যার কারণে শেষ ফল কি হবে তা চিন্তা করে স্থির মস্তিষ্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে হয়ত সম্ভব ছিল না।

জাতীয়করণ একটি সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ। লোকসংখ্যা পীড়িত সীমিত সম্পদের দেশে সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি যে দেশের জন্য মঙ্গলজনক, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে দেখতে হবে, যে পার্টির নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া হচ্ছে তার শ্রেণী চরিত্র কি? পার্টির নেতৃত্বে যারা রয়েছেন অর্থনৈতিক ও বাস্তব জ্ঞান তাদের কতটুকু রয়েছে এবং সর্বোপরি সমাজতন্ত্রকে কার্য্যকরি করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে যে পদ-ক্ষেপ নিতে হয় সেগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিত আদর্শবান কর্মী পার্টিতে রয়েছে কিনা? সমাজতন্ত্র একটা মন্ত্র নয় যে ফুঁ দিলেই সব কিছু হয়ে যায়। শুধু সদিচ্ছা, উৎসাহ ও ভাবপ্রবনতাই যথেষ্ট নয়। সমাজতন্ত্রের সত্যিকারের রূপায়নের জন্য অর্থনীতির জটিল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও তার সমাধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট কার্যকরী জ্ঞান থাকতে হবে। সমাজতন্ত্র সরকারী কর্মচারী দিয়ে হয় না। সমাজতন্ত্রের বাস্তব রূপায়নের জন্য সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায় তার বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ

www.pathagar.com

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সম্পন্ন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও হাজার হাজার দেশ প্রেমিক নিঃস্বার্থ ও নিষ্ঠাবান কর্মীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত অপরিহার্য। সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রধান শর্ত হলো তিনটি। প্রথমতঃ এর নেতৃত্ব দেবে একটি দৃঢ় চিত্ত, সাধু ও আদর্শবান রাজনৈতিক দল, এর সমর্থনে থাকবে হাজার নিষ্ঠাবান কর্মী ও এর পিছনে থাকবে একটি সুষ্ঠু ও সৎ প্রশাসন যন্ত্র।

এরূপ সৎ নেতা, কর্মী ও প্রশাসন যন্ত্রের সমন্বয় যেখানে ঘটে সেখানেই শুধু সমাজতন্ত্রের প্রচেষ্টা সফল হয় যা শেষ পর্যন্ত জনগণের জন্য অশেষ কল্যান বহন করে আনে। আর যেখানে এই তিনটি শক্তির যে কোন একটির অভাব ঘটে সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতো হয়ইনা; বরং প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থনৈতিক ধারাকে বিপর্যস্ত করে জাতির জীবনে অশেষ অকল্যান বহন করে আনে। দেশ স্বাধীন হবার পর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অতি-আগ্রহে পার্টির শ্রেণী চরিত্র, নেতৃত্বের ক্ষমতা, দলীয় সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা এবং পার্টি প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসন আছে কি নেই তা নিরূপন না করেই বাংগালী-অবাংগালী নির্বিশেষে সকল পাটকল জাতীয়করণ করা হলো। জাতীয়করণ করা হলো গোটা পাট ব্যবসা। এই জাতীয়করণের সময় এটা খেয়াল করা হলো না যে পাট এমন একটি বস্তু নয় যে শুধু বাংলাদেশেই জন্মে-অতএব বাংলাদেশই শুধু একমাত্র বিক্রেতা এবং যে দরই বাংলাদেশ দাবি করুক না কেন ক্রেতাগণ সেই দরেই কিনতে বাধ্য। আরো খেয়াল করা হলো না যে বিশ্বের পাটের বাজারে আমাদের সবচাইতে বড় প্রতি-দ্বন্দ্বী যে ভারত সেখানে পাটের ব্যবসা জাতীয়করণ করা হয়নি। ভারতের পাট ব্যবসা মূলতঃ মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, যারা এই ব্যবসায়ে একচেটিয়াভাবে অভিজ্ঞ, চতুর এবং প্রখর বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন। পাটের ব্যবসায় যাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন যে যুক্তরাজ্যের ডাণ্ডিই পৃথিবীর পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রন করে। এখানে বাজার ঘন্টায় ঘন্টায় উঠানামা করে। কোন দর বা অফার কয়েক ঘন্টা বা উর্দ্ধে একদিনের, দুদিনের বেশী স্থায়ী থাকে না। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বিক্রি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জাতীয়করণ করবার পূর্বে তদানীন্তন পাকি-

www.pathagar.com

স্তানের পাট ব্যবসায়ীরা সমানে সমানে ভারতের পাট ব্যব[illegible] সংগে প্রতিযোগিতা করে বিশ্বের বাজারে পাট বিক্রি করতে স[illegible] হয়েছে। অফার আসার সংগে সংগে কোন ক্ষেত্রে যদি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয়েছে তবে তাঁরা সেই সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু জাতীয়করণের পর বাংলাদেশে এই ব্যবসায়ের দায়ীত্ব দেওয়া হলো অনভিজ্ঞ সরকারী কর্মচারীদের উপর যাদের তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার বা যোগ্যতা কোন-টাই ছিল না। বিক্রির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে কিংবা নিদেন পক্ষে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন, যেটা নিতে নিতে বহু ক্ষেত্রেই অফারের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যেদিন থেকে পাট জাতীয়করণ করা হলো সেদিন থেকেই পাটের উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। যেখানে পাকিস্তান আমলে সমস্ত পাটকলগুলি বছরে কয়েক কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতো সেখানে আমাদের পাটকল সংস্থা বৎসরে কয়েক কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। জাতীয়করণ করার পর সমাজতন্ত্রের জন্য উৎসর্গি-কৃত প্রাণ কর্মী, পরিচালক বা পরিদর্শকের দ্বারা পাট ব্যবস্থা নিয়-ন্ত্রিত না হয়ে আদর্শহীন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীর দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের অবস্থান নাজুক পর্যায়ে নামতে আরম্ভ করলো। মিলের পাট ক্রয়ের ব্যাপারেও ব্যাপক কারচুপির দরুণ ফড়িয়া সহ পাটক্রয় সংস্থার অফিসের লোকজন কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করতে শুরু করলেন। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এই কারচুপির জন্যই পোড়ানো হয় বেশ কয়েক কোটি টাকার পাট। কম পাট কিনে বেশী পাটের হিসাব দেখানোই এই অগ্নিকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিলো। এই সময়ে পাট ক্রয়কারী কেন্দ্র ও সরকারী গুদামের মধ্যবর্তী নদীতে যে কত নৌকা ডুবেছে হিসাব নেই।

এইসব নৌকা ডুবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইচ্ছাকৃত হয়েছিল বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। ফলে ১৯৭০ সালে যেখানে বাংলাদেশ বিশ্ব-চাহিদার অর্ধেকের বেশী পরিমান সরবরাহ করতো সেখানে বর্তমানে এই সরবরাহের পরিমান দাঁড়িয়েছে মাত্র এক চতুর্থাংশ। পাটের ক্রয়, বিক্রয় রপ্তানির ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্যই এই

www.pathagar.com

র পাট ক্রয় কেন্দ্র থেকে মিলে সরবরাহ
ং ক্রয় সংস্থার কর্মচারী অফিসারদের মধ্যে
র্থর শক্তিশালী সেতু বন্ধন রচিত হওয়ায় প্রতি
কোটি কোটি টাকা লুন্ঠিত হচ্ছে। ফলে এক-
ক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে কম-
অত্যাধিক মূল্যে মিলে গছিয়ে দেওয়ায় উৎপাদিত
দ্রব্যের বড়ে যাচ্ছে। বিশ্ব বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক বিধায় বাংলাদেশ গুণগত মানে শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েও উৎপাদিত উচ্চমূল্যের দরুণ বৎসরে কোটি কোটি টাকার লোকসান বহন করে চলেছে। বাংলাদেশের উৎপাদিত মানের চাইতে কিছুটা নিম্নমানের পাটজাতদ্রব্য ভারত কিংবা থাইল্যাণ্ড বা চীন অনায়াসে অনেক কম মূল্যে সরবরাহ করতে সক্ষম। লোকসান দিয়ে মিল চালাতে গিয়ে পাট কল সংস্থা প্রতি বৎসরই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বেসরকারীখাতে ঋণদানের ক্ষমতা প্রায়ই বিলুপ্ত। নতুন খাতে শিল্প গড়াতো দূরের কথা বেসরকারী খাতের পুরানো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিরও কার্যকরী মূলধনের অভাবে ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। পাটকে কেন্দ্র করে বর্তমানে একটা বিরাট লটপাট চলছে। এই লুট পাট যদি অচিরেই বন্ধ না করা হয় তবে পাটের অবস্থাও শেষ পর্য্যন্ত নীল চাষের বেদনাদায়ক ইতিহাসে পরিণত হবে।

বাংলাদেশে পাটের দর বর্তমানে মন প্রতি ৪০ থেকে ৬০ টাকার মধ্যে। কিন্তু সীমান্তের ওপারের দর ভারতীয় টাকায় একশত টাকার উর্দ্ধে। অর্থাৎ আমাদের টাকার মুক্ত বাজার দর হিসাবে প্রায় চার পাঁচ গুণ বেশী। ১৯৭৮ সালে আমাদের এখানে পাটের দর ছিল ১২৫ থেকে ১৮০ টাকার মধ্যে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে এই দর অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যায়। নজির-বিহীন খরার দরুণ পাটের ফলন কম ও কোয়ালিটি নিম্নমানের হওয়ায় বিশ্ববাজারে এর প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। ভারত-বাংলাদেশ ছাড়াও বার্মা, নেপাল, থাইল্যাণ্ড, চীন, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে পাট উৎপন্ন হচ্ছে। শুধু গুণগত মানের জন্যই বাংলাদেশ পাটের বিশ্ববাজারে টিকে আছে। বাংলাদেশ থেকে যে কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানী হয় তার অধিকাংশই

www.pathagar.com

উন্নতমানের তোষা পাট। সিল্‌কের সাথে ভেজাল হিসাবে এই পাট ব্যবহৃত হয়। চটের বস্তার জন্য নিম্নমানের পাট ব্যবহৃত হয় যা অন্যান্য দেশ সহজেই সরবরাহ করতে পারে। বাংলাদেশের মিল থেকে তৈরী হয়ে যা বিদেশে রপ্তানী হয় তার অধিকাংশই হেসিয়ান যা প্যাকিং মেটিরিয়াল হিসাবে কাজে লাগানো হয়। এ ছাড়া রয়েছে ব্রডলুম এবং কার্পেট ব্যাকিং। এর জন্য উন্নতমানের পাট প্রয়োজন। ১৯৭৮ সালে পাটের বাজার অস্বাভাবিক তেজী থাকার ফলে অনেক শিপারই ফরোয়ার্ড সেল দেওয়া কাঁচা পাট সরবরাহ করতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশের উপর বিরক্ত হয়ে অনেক বিদেশী ক্রেতাই বেশী মূল্যে ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে ১৯৭৯ সনে পাট কিনতে আরম্ভ করে এদিকে '৭৯ সনে প্রচণ্ড খরার দরুণ অধিকাংশ পাট নিম্নমানের হওয়ার দরুণ উন্নতমানের পাটের যে চাহিদা বাংলাদেশ প্রতি বৎসর মেটাত তা থেকেও বঞ্চিত হলো। ফলে এবার যখন পাটের মওসুম শুরু হয়েছে তখন পাটের বাজার অত্যন্ত মন্দা। এ মন্দার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে বাজারে পাটের ক্রেতার অভাব। পাটের সর্ববৃহৎ খরিদ্দার হচ্ছে জুট মিলসমূহ, জেটিসি এবং জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন। গত বৎসর এই সংস্থাত্রয় সরকারী চাপে পড়ে কিছু পরিমাণ নিম্নমানের পাট কিনেছে। এই পাটের অধিকাংশই আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি সম্ভব হয়নি। ফলে জেটিসি ও জে, এম, সির যেমন মূলধন আটকা পড়েছে তেমনি ভর্তি রয়েছে গুদামসমূহ। ফলে নতুন করে পাট কেনার আগ্রহ ও যোগ্যতা তাদের নেই। জুট মিল গুলিও গত বৎসর বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অনেক কম দ্রব্য উৎপাদন করায় বহু পাট অব্যবহৃত রয়ে গেছে। জুটমিল কর্পোরেশনের মতে মিল গুলির গুদামে এখনও যে পাট রয়েছে তাতে আরও ছয়মাস উৎপাদনের কাজ চলবে। দেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ গড়ে ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ বেল। গত বৎসর উৎপন্ন হয়েছে মাত্র ৪০ লক্ষ বেল। এর মধ্যে অধিকাংশই অবিক্রিত রয়েছে। উৎপন্ন পাটের প্রায় ৪০ শতাংশ প্রতি বৎসর দেশীয় মিলে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় এ বৎসরে যদি মিলগুলি আগামী ছয় মাস পাট না কিনে তা হলে পাটের বাজারে নিম্নমুখী প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। সরকারী গুদামে স্থান সংকুলানের অভাবে সরকারী পাট

www.pathagar.com

ক্রয় প্রতিষ্ঠান সমূহও পাট ক্রয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। পাট কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না ফড়িয়া ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাও।

জে, এম, সি ও জে, টি, সি'র পাট ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা একুনে ৩৫০-এর উর্দ্ধে হবে না। বড় বড় মোকামেই শুধু এদের ক্রয় সীমাবদ্ধ থাকে। দেশের গভীর অভ্যন্তর অঞ্চল থেকে ছোট ছোট ফড়িয়ারাই পাট কিনে এনে সরকারী ক্রয় কেন্দ্রে বিক্রি করে। অন্যান্য বৎসর সরকার পাটের একটা নিম্নতম দর ঘোষণা করায় ছোট ব্যবসায়ীগন সর্ব নিম্ন দরের প্রেক্ষিতে যতদূর সম্ভব মুনাফার অংকটা হাতে রেখে পাট ক্রয় সংস্থা বাজারে নামবার আগেই কিছু কিছু পাট কিনতে আরম্ভ করতো। এই অগ্রিম কেনা বেচায় আভ্যন্তরীণ বাজারে দরের মোটামুটি একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। এবারে এই নিয়ম চালু না থাকায় অন্যান্য বৎসরের এই সময়টিতে পাটের বাজার যেমন প্রানবন্ত থাকে এবার আদৌ তেমন কোন অবস্থাই বিরাজ করছেনা। গত বৎসর পাটের মন প্রতি সরকারী দর ছিল ১১৫ টাকা। গত বৎসর অধিকংশ ক্ষেত্রে নিম্ন মানের পাট উৎপন্ন হওয়ার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সেই পাটের চাহিদা কম থাকার সুযোগে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ৪০/৫০ টাকা দরে পাট কিনে সেই পাটই সরকারের কাছে ১১৫ টাকা দরে গছিয়ে দিয়ে, ফড়িয়া ও সরকারী ক্রয় সংস্থার কর্মকর্তারা মিলে ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা মেরে দিয়েছে ; অথচ কৃষক প্রকৃত উৎপাদন মূল্যও পায়নি। এবার সরকার নিম্নতম দর বেঁধে না দেওয়ায় এবং গত বৎসরের ন্যায় বিরাট লুটের সম্ভাবনা কম থাকায় পাট ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে বসে আছে এই আশায় যে পাটের দামের অত্যাধিক অধোগতি হলে, কৃষকের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে সরকার বাধ্য হয়েই শেষ পর্যন্ত একটি নিম্নতম দর ঘোষণা করবেন যে দর গত বৎসরের চেয়ে কোন অবস্থাতেই কম হবে না। তখন পুনরায় গত বৎসরের মতই ক্রেতা ও বিক্রেতা ব্যবসায়ীরা, মিলে একটা বড় রকমের দাও মারতে পারবে। যতদূর মনে হয় সরকার একটা নিম্নতম দর বেঁধে না দেওয়া পর্যন্ত ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা, সরকারী পাট ক্রয় সংস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য পরিমানে পাট ক্রয় করবে না। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—কৃষকদের স্বার্থে একটা সর্বনিম্ন ক্রয়মূল্য ঘোষণা কি একান্তই অপরিহার্য ? গভীর ভাবে চিন্তা করলে মনে হয় এই নীতি খুব যৌক্তিক নয়।

www.pathagar.com

পাটের দর সাধারণতঃ নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ও শিপারদের রপ্তানির ব্যাপারে যথাযথ প্রতিশ্রুতি রক্ষার উপর। ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিক চাহিদা হঠাৎ খুব বেড়ে যাওয়ায় সরকারী দর ১২৫ টাকা থাকা সত্বেও পাটের মূল্য ১৫০ থেকে ১৭৫ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। এতে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে পাটের মূল্য নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে বিদেশে চাহিদার উপর এবং সে সংগে কিছুটা কৃষকের পাট ধরে রাখার ক্ষমতার উপরও। গত কয়েক বৎসর সরকারের দুর্বল নীতির ফলে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যের যেভাবে উর্দ্ধগতি হয়েছে তাতে অধিকাংশ কৃষকই আর্থিক দিক থেকে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ফসল উঠবার আগেই অধিকাংশ কৃষক এত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে পাট কাটার সংগে সংগে তা বিক্রি না করে তাদের কোন উপায়ই থাকে না। তাদের এই আর্থিক অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেয় ফড়িয়া ও মধ্যসত্বভোগী ব্যবসায়ীগণ। কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণ এইভাবে চলতে থাকলে আগামী বৎসরে কৃষক সমাজ ৩০ টাকার কম মূল্যেও পাট বিক্রি করতে বাধ্য হবে। পাট উৎপাদনকারী কৃষক সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে সরকার যদি বাস্তবধর্মী কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে অদূর ভবিষ্যতে নীল চাষের মতই ধীরে ধীরে পাট চাষ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন, সরকার দুশো টাকা করে পাটের দর নির্ধারণ করে দিলে ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীরা কমপক্ষে কৃষককে ১০০/১২৫ টাকা দিবে। তাতে চাষী সম্প্রদায় কিছুটা বেশী মূল্য পাবে এতে সরকারের হয়ত কিছুটা আর্থিক ক্ষতিই না হয় হলো। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এই নীতিতে সমস্যার সমাধান তো হবেই না; বরং সর্বনাশ আরো ত্বরান্বিত হবে। নিম্নতম মূল্য ২০০ টাকা বেঁধে দিলে আন্তর্জাতিক বাজার পর্যন্ত গিয়ে এই পাটের মূল্য একুনে এমন একটি অংকে দাঁড়াবে যার সাথে প্রবাহমান মূল্যের অসংগতির দরুন বিদেশের বাজারে পাট বিক্রয় সম্ভব হবে না। আমরা কৃষকদের বেশী মূল্য দিয়েছি একথা বলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে বেশী মূল্য আদায় করা যাবে না। এ ছাড়াও আর একটি বিষয় চিন্তা করার আছে। দ্রব্যমূল্যের বর্তমান অবস্থায় ২০০ টাকা কৃষকদের জন্য হয়তো উচিৎ মূল্য বিবেচিত মনে হতে পারে;

www.pathagar.com

কিন্তু কিছুদিন পরে যখন দ্রব্যমূল্য আরও অনেক বেড়ে যাবে তখন ২০০ টাকা মনও কৃষকদের জন্য অলাভজনক হয়ে দাঁড়াবে। বহু রাজনৈতিক দলই পাটের মূল্য ২০০ টাকা বেঁধে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করছে কিন্তু তারা ভেবে দেখছে না যে সরকারের দেয় নিম্নতম মূল্য কৃষকদের জন্য যতক্ষণ নিশ্চিত করা না যাবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকবার মত কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ সম্ভব না হবে ততক্ষন কৃষকদের স্বার্থের নামে একটি অবাস্তব নীতি গ্রহণের কোন অর্থই হয় না। কৃষকের জন্য পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করণ যে একটা বাস্তব সমস্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের কৃত্রিম মূল্য বাড়িয়ে এই সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। এর সমাধান নিহিত রয়েছে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য রোধের মধ্যে। আজ পশ্চিম বংগে যে রূপ মোটামুটি পরার শাড়ী ২৪/২৫ টাকায় পাওয়া যায় এবং দক্ষিন ভারতের তৈরী একটি লুঙ্গি ১২/১৪ টাকায় পাওয়া যায়, আড়াই থেকে তিন টাকার মধ্যে এক কেজি চাউল এবং ৮/১০ টাকার মধ্যে এক কেজি মাঝারি সাইজের মাছ পাওয়া যায়—এমনটি যদি আমাদের দেশেও সম্ভব হ'তো, তবে ১০০ টাকা পাটের মন প্রতি মূল্যকে কৃষকের জন্য ইকনমিক মূল্য বলেই গন্য করা হতো। তাই আজ আন্দোলন হওয়া উচিৎ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য রোধের লক্ষ্যে সরকারকে বাস্তবধর্মী অর্থনীতি অনুসরণে বাধ্য করা। আজ দেশব্যাপী অনুৎপাদন ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয়ের যে মারাত্মক প্রবণতা চলছে যার ফলশ্রুতি বিপুল মুদ্রাস্ফীতি, সমস্ত প্রশাসন বিভাগ ও সেকটর কর্পোরেশন গুলিতে উন্নয়নের নামে যে সীমাহীন লুন্ঠন চলছে এবং ব্যাংক সমুহে অফিসারদের যোগসাজসে যে বিপুল অংকের তহবিল তসরূপ হচ্ছে, তা দেশের জন্য চরম অশুভ পদধ্বনি। যে কোন মূল্যে এই সর্বনাশকে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রচলিত আইনের কাঠামোতে লুন্ঠনের এই মারাত্মক উন্মাদনা বন্ধ করা সম্ভব নয়। লুন্ঠনের দায়ে কোন অপরাধীকে জেলে পাঠালে আত্মসাতের সামান্য পরিমান টাকা খরচ করেই সে মামলা মুকাবেলা করতে পারে। এমনকি ৫/৭ বৎসরের জেল হলেও তার কোন অসুবিধা হয় না। জেলে বসেই সে টাকার দ্বারা উদ্বৃত্ত সুবিধাভোগ এবং জেল-পরবর্তী জীবনে সামান্য টাকা চাঁদা দিয়ে সমাজ জীবনের সম্মানজনক স্থানে পুণর্বাসিত হ'তে পারে। কাজেই লুন্ঠনকে বন্ধ

www.pathagar.com

করবার লক্ষ্যে আরও সুচিন্তিত এবং কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যার ফলে অর্থ আত্মসাতকারীরা লুন্ঠিত সম্পদ ভোগ ও সমাজে সম্মান—এই দুই দিক থেকেই বঞ্চিত হবে। প্রয়োজনে প্রানদণ্ডাদেশ বা নির্দেনপক্ষে বেত্রাঘাতের মত কঠোরতম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাটের ব্যাপারে আজ যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভ্রান্ত অর্থনীতি অনুসরণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমূহের এটি একটি স্বাভাবিক পরিণতি। অযোগ্য পরিচালনা ও নজির-বিহীন চুরির জন্য জুটমিল গুলিতে বর্দ্ধিত উৎপাদন করতে গিয়ে অনেক মিল গোটা মূলধনের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ নিয়ে বসে আছে যা পরিশোধ করা কোনদিনই সম্ভব নয়। এটা যে শুধু জুটমিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়, জাতীয় করণের পর বস্ত্রকল সমূহেও অনুরূপ অবস্থাই বিরাজ করছে। কাঁচাপাট রপ্তানিকারকেরাও পাটের বাজারের বড় খরিদ্দার। ব্যাংক ঋণ সংকোচনের ফলে তারাও ব্যাংক থেকে এবার প্রয়োজনমত টাকা পাচ্ছে না। গত বৎসরের আগের বৎসর পাটের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে কম দামে পাট ফরওয়ার্ড সেল দিয়ে পরে বেশী দামে কিনে মাল সরবরাহ করতে গিয়ে বহু শিপারই তাদের মূলধন খুইয়েছে। তাই গত বৎসর অনেকেই ব্যাংক ঋণ পরিশোধে সমর্থ হয়নি, এবার তারা ঋণ পাচ্ছে না। ফলে সমস্ত ব্যবসায়ীদের পাট ক্রয়ে অনীহা পাটের বাজারে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে পাটের বাজারের নাজুক অবস্থার দরুণ বাংলাদেশের অর্থনীতি চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন। উপযুক্ত ক্যাডার ও মিল পরিচালনায় অভিজ্ঞ পরিচালক পার্টিতে সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপের নামে মিল, কলকারখানা, ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ করতে গিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি অফিসারদের লুটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই অসময়োচিত জাতীয়করণের জন্য জনগন সমাজতন্ত্রের সুফলের পরিবর্তে পেয়েছে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা। অফিসারদের লুন্ঠন ও শোষনকে জায়েজ করতে গিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়েছে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য যা সাধারণ জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বহির্ভূত। দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়েও যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না, সরকার

www.pathagar.com

তখন কাগজের নোট ছেপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। নিত্য নতুন করারোপও এই ক্ষয়মান অর্থনীতিরই একটি অধ্যায়। রাষ্ট্রায়ত্বকরণের সুফল জনসাধারণ না পেলেও যদি শ্রমিক শ্রেণী পেতো তবুও দুঃখ ছিল না। কিন্তু এই দু'য়ের কেউ লাভবান না হয়ে সম্পূর্ণরূপে লাভবান হলো সুবিধাবাদী ও স্বার্থান্বেষী সরকারী কর্মচারীগণ যারা জাতীয়করণের পর থেকেই এই প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিচালনার দায়ীত্বে নিয়োজিত। আজ কে না জানে একটি বস্ত্রমিলের ম্যানেজারের মাসিক উপরি আয় কম পক্ষে ৫০ হাজার টাকা। শোষণের সাধারণ নিয়মেই তাঁতী সমাজ তিনগুন মূল্যে সুতা কিনতে বাধ্য হচ্ছে। মূল্যের এই প্রবৃদ্ধি পরোক্ষভাবে জর্জরিত করছে কৃষক সমাজকে। তাঁতীর ব্যবসা এই কারণেই সিকেয় উঠেছে। বাংলাদেশের ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার তাঁতই এখন অকেজো। তাঁত শিল্পে নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষ বিকল্প উপায়ের চিন্তায় হন্নে হয়ে ফিরছে। সকল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই দারুণ সংকট বিরাজমান। ব্যাংকের পরিচালকদের অনুগ্রহভাজন মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ ব্যবসায়ীরা কোন ঋণ পাচ্ছে না। জাতীয়করণ-কৃত ব্যাংক সমূহে কি ধরনের লুট হচ্ছে তার খবর জানা যায় ব্যাংকের সর্বশেষ বুলেটিনে। তাতে জানা যায় ব্যাংক সমূহে এযাবৎ ৬৩ কোটি টাকার তহবিল তসরূপ হয়েছে। জালিয়াতিতে ব্যাংক সমূহ হারিয়েছে ৬ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। জাতীয়করণের পূর্বে ২০/২৫ বৎসরেও এধরনের কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠান। বীমা কোম্পানীতেও অনুরূপ জালিয়াতি পুরাদমে চলছে। টাকা খরচ না করলে সত্যিকারের ক্লেইমের টাকাও পাওয়া যায় না, আবার পয়সা খরচ করলে লক্ষ লক্ষ টাকার ভুয়া ক্লেইমের টাকা পেতেও কোন অসুবিধা হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছেন তাদের কাছে এটা ওপেন সিক্রেট।

উপরোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশের অর্থ-নীতি সার্বিক অচল অবস্থার দিক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব জাতীয়করণ ব্যবস্থা তুলে নিয়ে সমস্ত কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দিতে হবে। ব্যক্তি

www.pathagar.com

মালিকানায় শ্রমিক ও জনগণ শোষিত হয় এটা অনস্বীকার্য, কিন্তু সেই শোষণের সীমা একটা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ব করণের নামে যে শোষন হচ্ছে তাতে জনগণ ক্রমানুয়ে রক্তহীনতা থেকে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন শোষণ এত তীব্র ও সর্বগ্রাসী নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মালিকরা শোষণ করে যে অর্থ উপার্জন করে তা দিয়ে তারা নতুন নতুন কারখানা স্থাপন করে। ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু কলকারখানায় বর্তমানে যে লুন্ঠন হচ্ছে তার ফলে নতুন শিল্পতো হচ্ছেই না, বরং বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে। অর্থ দেশে থাকলেও তা বেনামে বাড়ি কিংবা গাড়ীর পিছনে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফলে এই অর্থ উৎপাদনী ক্ষেত্রে লগ্নি করা হচ্ছে না। এতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া সমাজ বা দেশের কোন লাভ হচ্ছে না।

সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অনেক রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও অর্থনীতি-বিদের ধারণা যে একবার যখন জাতির পিতা কর্তৃক শিল্প কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়েছে তখন সেগুলি ব্যক্তি মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ তার নীতির সাথে দ্বিমত প্রকাশ করা। এই ধারণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নয় বলেই মনে হয়। শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ বা পরিপূর্ণতা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। ১৯৭২ সনে বাংলাদেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রবেশের অনুকুলে ছিল কিনা এই প্রশ্নের যথাযথ বিশ্লেষণ ব্যতীতই মনে হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পরিস্থিতির চাপে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার এই অসময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উপযুক্ত ক্যাডারের অভাবে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ও নৈরাজ্য দেখা দেয় তাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ সাহেব কিছু দিনের মধ্যেই এই অসময়োচিত জাতীয়করণের মারাত্মক পরিনতি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। তাই বেসরকারী ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগের সীমা ১৯৭২ সনে যেখানে ২৫ লাখে সীমাবদ্ধ ছিল তা ১৯৭৪ সনে বাড়িয়ে তিন কোটি পর্যন্ত করা হয়েছিল। ১৯৭২ সনে যে কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্টায়ত্ব করা হয়েছিল তার পরবর্তী বৎসরগুলিতে নতুন করে আর কোন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন

www.pathagar.com

শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ব করা হয়নি। এতদব্যতীত আওয়ামী লীগের শাসনের শেষ দিকেই "ডিজইনভেস্টমেন্ট নীতি" গ্রহণ করতঃ বেশ কয়েকটি শিল্প কারখানা ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এথেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উপযুক্ত সময় আসার পূর্বেই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী ভুল সংশোধনের পদক্ষেপও আওয়ামী লীগ সরকার ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু দেশের তৎকালীন বস্তুগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ অতি দ্রুত সম্ভব ছিল না। এতদিন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যবস্থা করন নীতি প্রত্যাহার করে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূলে পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করতেন এবং ইতিমধ্যে পার্টিতে হাজার হাজার নিবেদিত ক্যাডার সৃষ্টি করতেন সমাজতন্ত্রকে সফল করবার জন্য। নতুবা বাকশাল অর্থনীতির মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপকে সফল করবার জন্য কঠিন হস্তে রাষ্ট্রায়ত্বক্ষেত্রে সমস্ত দুর্নীতি দূর করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আজ এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, না সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে শিল্প বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে, না পুঁজিবাদী নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির বন্যায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়তে বাড়তে জনগন ও গোটা অর্থনীতির পাঁজর ভেঙ্গে ফেলেছে।

জাতীয়করণের ব্যাপারে বামপন্থী নেতৃবৃন্দের জাতীয় স্বার্থে বর্তমান মুহূর্তে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের মধ্যেই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিহিত আছে বলে অনেকে মনে করেন। সাময়িকভাবে হলেও জাতীয়করণ নীতি প্রত্যাহার করে দেশকে লুটপাটকারীদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কোন বামপন্থী দলের আগামী পাঁচ ছয় বৎসরেও ক্ষমতায় আসার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে শোষণ ও অরাজকতা চলছে এটা আর দু'চার বৎসর চললে দেশের অবস্থা কি দাঁড়াবে ধারণা করা যায় না। দেশ আগে বাঁচুক তারপর সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী কোন দল যদি ক্ষমতায় আসতে পারে এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী যদি পার্টিতে থাকে এবং দলের নেতৃত্বে সেরূপ চিন্তাশীল উপযুক্ত নেতৃবৃন্দ থাকেন, তখন জাতীয় স্বার্থে কল কারখানা পুনরায় জাতীয়করণ করতে বাধা কোথায় ?

www.pathagar.com

বেকারত্ব ও সরকারী-নীতি

অর্থনীতিতে বলে, সরকারী ব্যয় জনসাধারনের আয়, আর জনসাধারনের ব্যয় হলো সরকারের আয়। অর্থাৎ সরকার নানাভাবে যে অর্থ খরচ করেন সেটা নানাবিধভাবে জনসাধারনের মধ্যে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে। ফলে জনসাধারন উপকৃত হয়। তবে এই অর্থ ব্যয়করার পরিকল্পনা তৈরির সময় স্মরন রাখতে হবে এই কর্মের সুযোগ সৃষ্টি যাতে স্থায়ী ফল উৎপাদন করে। অর্থাৎ উৎপাদন খাতে যাতে ব্যয় হয়। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে রাস্তা ঘাট, দালান কোঠা তৈরির মারফৎ কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ লোকের সাময়িক ভাবে কর্ম সংস্থান করা চলে কিন্তু জাতি তাতে বিশেষ উপকৃত হয় না। উপকৃত হয় তখনই যখন ঐ অর্থের বিনিময়ে এমন সব শিল্প গঠন হয় যাতে প্রচুর লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়।

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে প্রথমাবধিই শিল্প ও বানিজ্য ক্ষেত্রে এমন সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার ফলে মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান ত হচ্ছেই না, বরং বর্তমানে যারা কর্মে নিয়োজিত আছে তাদেরও অচিরে বেকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বর্তমানে যে শিল্পনীতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে একজন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের জন্য কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। প্রতিবৎসর আমাদের দেশে ২৫/৩০ লক্ষ করে জনসংখ্যা বাড়ছে। এই হিসাবে কমপক্ষে ৮/১০ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে যাদের জন্য আমাদের কর্মসংস্থান করতে হবে। এর জন্য যদি প্রতিজন ৩ লক্ষ টাকা করে বৎসরে একলক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করতে হয়, তবে প্রয়োজন হবে তিন হাজার কোটি টাকা যা আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে অসম্ভব। তাই আমাদের এমন সব শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে যেগুলি পুঁজি প্রধান না হয়ে শ্রম প্রধান হবে। রাস্তাঘাট বা দালান কোঠা তৈরী, যে গুলিতে কর্মসংস্থান একেবারেই সাময়িক সে গুলি বাদ দিলেও বর্তমানে যে ধারায় কর্মের সংস্থান হচ্ছে, যেমন ট্রাক, বাস চালনা বা বিভিন্ন ধরনের কলকারখানা স্থাপন,

www.pathagar.com

এগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একটি লোকের কর্মসংস্থানের জন্য তিন থেকে চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় একটি ট্রাক বা বাস যার মূল্য তিন চার লক্ষ টাকার উপরে তার মারফৎ কর্মসংস্থান হয় মাত্র দুই জনের—ড্রাইভার ও একজন হেলপারের। একটি ২৫,০০০ টাকুর সুতাকল যাতে দেশী ও বিদেশী মুদ্রায় কমপক্ষে ১৪/১৫ কোটি টাকা লাগবে তাতে কর্মসংস্থান হবে প্রতি শিফটে ৪৩০ থেকে ৪৫০ জন শ্রমিকের। অর্থাৎ প্রতি জনে তিনলক্ষ টাকার মত।

দেশের ভৌগোলিক আয়তন যদি খুব বড় হয় এবং কৃষিযোগ্য ভূমি যদি যথেষ্ট পরিমানে থাকে আর লোকসংখ্যা কম হয় তবে কৃষি সম্পর্কিত বহু কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অধিকাংশ জনসাধারণের মোটামুটি কর্মসংস্থান করা চলে। কিন্তু অবস্থা যদি বিপরীত হয় তবে অধিকাংশ লোকের কর্মসংস্থান করতে হবে শিল্প সংগঠন ও ব্যবসা বানিজ্যের মারফৎ। কিন্তু বর্তমান শিল্পক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হচ্ছে তাতে উপযুক্ত সংখ্যক শিল্প গঠন পুঁজির অভাবে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া বর্তমান শিল্পনীতি পুঁজি প্রধান হয়ে, অবস্থা আরও মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় ক্রমাগত প্রশাসন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শাসনযন্ত্রকে চালু রাখতে অর্থ সংস্থান করতে গিয়ে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ক্রমাগত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির দরুন নুতন শিল্পতো দূরের কথা পুরাতনগুলিই মালিকদের পক্ষে চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। কাঁচামালের উপর অধিক হারে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির ফলে দেশে তৈরী শিল্প দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করা শিল্প দ্রব্যের সংগে কোন ভাবেই প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। উদাহরন স্বরূপ, সিলিং ফ্যানের কথা উল্লেখ করা চলে। কাঁচামালের উপর গড়ে ৩০/৪০ পারসেন্ট এবং রং, ক্যামিক্যাল্‌স প্রভৃতি কোন কোন আইটেমের উপর ৫০/৬০ পারসেন্ট ও তারপর ৫/১০ পারসেন্ট আবগারী ট্যাক্‌স দিয়ে আমাদের দেশের ফ্যান ইনডাস্ট্রীগুলো গত বৎসরের প্রথম দিকেও ১১০০ টাকায় একটি সিলিং ফ্যান বিক্রি করতে পারত। কিন্তু গত বৎসরের প্রথম দিকে সরকার হঠাৎ ফ্যানের উপর আমদানী শুল্ক ১০০% থেকে কমিয়ে ৫০% নিয়ে আসায় দেশীয় ফ্যান গুলি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে

www.pathagar.com

প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বহু লেখালেখি ও চেঁচামেচির ফলে অবশ্য সরকার ডিউটি আবার ১৫০% করে দেশীয় কারখানা গুলিকে বাঁচানোর প্রয়াস পেয়েছেন বলে শোনা যায়। কিন্তু নিম্ন অংকের ডিউটির সুযোগ নিয়ে এর মধ্যে বেশ কয়েক কোটি টাকার ভারতীয় পাখা বাজারে এসে গেছে যেগুলি আগামী এক বৎসরের সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে পারবে। অর্থাৎ আমাদের পাখা তৈরির কারখানাগুলিকে আরও এক বৎসর লোকসান টানতে হবে। ফলে নুতন শ্রমিক নিয়োগতো দূরের কথা পুরাতন শ্রমিকদের মধ্যেও অনেকের বেকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর উল্লেখ করা যায় মুদ্রন শিল্পের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় ছাপার কালি তৈরীর কারখানা সম্পর্কে। শিক্ষা বিস্তারের সংগে মুদ্রন শিল্পের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং মুদ্রন শিল্পের কাঁচামাল গুলির মধ্যে কালি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আইটেম। তাই কালির মূল্য যতদূর সম্ভব সুলভ রাখার স্বার্থে সরকারের উচিৎ ছাপার কালি তৈরীর কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক যথাসম্ভব কম রাখা। কিন্তু এই শিল্পের কাঁচামালের উপর শুল্ক ধার্য করে রেখেছেন গড়ে ৩৫/৪০% আর আমদানি করা কালির উপর এতদিন শুল্ক ছিল ৩০%। বর্তমানে অবশ্য করা হয়েছে ৫০%। হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি বাক্স বা কারটন যে সমস্ত প্যাকেজিং শিল্প এখানে তৈরী করে তাদের আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর ডিউটি দিতে হয় গড়ে ৭৫% থেকে ১০০% আর রফতানিকারকেরা চিংড়ি রপ্তানির প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ বাক্স বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারেন বিনা শুল্কে। এই নীতির ফল হয়েছে যে প্যাকেজিং শিল্পগুলো এদেশে মরতে বসেছে। আর ওদিকে লক্ষলক্ষ টাকার কারটন বিদেশ থেকে আমদানি হচ্ছে যার ছাপা ও তৈরী খরচ বিদেশী প্যাকেজিং শিল্প গুলো পেয়ে যাচ্ছে। এর ফলাফল বাংলাদেশী মুদ্রন ও প্যাকেজিং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে কিরূপ হয় তা সহজেই অনুমেয়! এই ভ্রান্ত শিল্প ও আমদানী নীতির ফলে বহু শিল্পে সংকট দেখা দিচ্ছে। যার ফলে বেকারত্ব দূর না হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে উন্নয়নের নামে যা চলছে তা স্রেফ লুট পাট ছাড়া আর কিছু নয়। ভাল রাস্তা ক্রমাগত কার্পেটিং-ডবল কার্পেটিং করা, আইল্যাণ্ড ভাংগা, কোটি কোটি মন ধান চাল সি, এস, গোডাউন

www.pathagar.com

থেকে উধাও হয়ে যাওয়া, লক্ষ লক্ষ টাকার সার ও কীট নাশক ঔষধ চুরি বা নষ্ট হয়ে যাওয়া, লক্ষ লক্ষ টাকার তৈরী বাড়ীঘর বৎসর না যেতে কোথাও কোথাও নির্মাণ অবস্থায় ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদির মারফতে কয়েকশত কোটি টাকার অপচয় হচ্ছে। আর এই ঘাটতি পুরনের জন্য শিল্প কারখানা গুলিতে ক্রমাগত আবগারী শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাঁচামালের উপর আমদানী শুল্ক বাড়ান হচ্ছে। এ সম্পর্কে জুতার উপর আবগারী শুল্ক ১০% ও প্যাকেজিং শিল্পের উপর ৫% এর কথা উল্লেখ করা যাতে পারে।

সরকারের বিভিন্ন ভুল সিদ্ধান্তের ফলে শিল্প কারখানা বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার ফলে নুতন শ্রমিক নিয়োগতো দূরের কথা পুরাতন শ্রমিকদেরও অনেকেই বেকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের পুনঃপুনঃ মূল্যবৃদ্ধি ও অনিয়মিত সরবরাহের ফলে ছোটছোট শিল্প কারখানা গুলো দারুন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা কাজের সময়ের মধ্যে ১৪/১৫ ঘন্টাই বিদ্যুত থাকেনা। তাতে ছোট ছোট কারখানায় উৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের মূল্য অনেক বেশী পড়ে যাচ্ছে বলে বিদেশী মালের সংগে প্রতিযোগিতায় হটে যাচ্ছে। এদিকে বিদ্যুতের মূল্যও অযৌক্তিক ভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সরকার তেলের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাত দেখাচ্ছেন যা যুক্তিতে মোটেই টেকেনা। মোট উৎপাদিত আনুমানিক পৌনে পাঁচশত মেগাওয়াট বিদ্যুতের মধ্যে মাত্র ২৬ শতাংশ বিদ্যুত, যেটা পদ্মার অপর পারে উৎপন্ন হয়, শুধু পেট্রোলে ও ডিজেলে উৎপন্ন হয়। বাকি ৭৪ শতাংশ বিদ্যুতই উৎপন্ন হয় শাহজিবাজার ও ঘোড়াশালের গ্যাস ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পানি থেকে যার জন্য সরকারকে এক পয়সাও বিদেশী মুদ্রা খরচ করতে হয় না। সরকার যদি বলেন যে প্রেট্রোবাংলা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে এবং বর্তমানে বিভাগীয় খরচও বেড়ে গেছে তবে উত্তরে বলা চলে যে গ্যাসের কনজামসন ও সেল্‌স বহুগুন বাড়ার ফলে প্রেট্রোবাংলার আয়ও বহুগুন বেড়ে গেছে। তাই তেলের আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধির সংগে সামগ্রিক ভাবে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। শুধু পদ্মার ওপারে অর্থাৎ খুলনা, বরিশাল, উত্তর বংগ এলাকার জন্য যে ২৬ শতাংশ বিদ্যুত পি, ডি, বি উৎপাদন করে তার উপরেই

www.pathagar.com

তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব পড়তে পারে। সেটা কোন অবস্থাতেই ১৯৭২ সন পর্য্যন্ত যেখানে ইউনিট প্রতি দাম ছিল গড়ে ২০ পয়সা সেখানে পাঁচ ছয় গুন বাড়িয়ে ১·২৫ পয়সা করার কোন অর্থ হয় না। এই অধিক মূল্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে চুরি, অপচয়, মাথাভারী প্রশাসন প্রভৃতির কারনে। এগুলি বন্ধ করে আয় অনেক পরিমান বৃদ্ধির পরিবর্তে পি, ডি, বি শুধু বিদ্যুতের মুল্য বৃদ্ধি করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন যেটা দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর জন্য আর একটি মৃত্যুবান হলো মিনিমাম চার্জ প্রথা। যে সমস্ত ছোট ছোট ইঞ্জি-নিয়ারিং কারখানায় এক দেড় বা দুই ঘোড়ার মটর আছে তাদের সাধারনতঃ দৈনিক দশ ঘন্টা চললে গড়ে একশত থেকে দুইশত টাকা মিটারে চার্জ উঠবে ১.২৫ পয়সা রেট হিসাবে। সাধারনতঃ দৈনিক তিন চার ঘন্টা বিদ্যুত সরবরাহ না থাকার ফলে মিটারে চার্জ আরও কম উঠার কথা। কিন্তু বিদ্যুত বিভাগের নুতন নিয়ম অনুযায়ী কারখানা চালু থাক আর না থাক, মিটার উঠুক আর না উঠুক কারখানা মালিককে মাসে ন্যুনতম ৫০০ টাকা দিতেই হবে। কর্তৃপক্ষের যুক্তি হলো বিভাগীয় কর্মচারিরা মালি-কের সংগে যোগসাজসে মিটারের রিডিং কম দেখায়। তাই মিনিমাম চার্জ বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। সব সরকারী কর্মচারীই চোর নয়, আর সব কারখানার মালিকই চোর নয়। তাই এই আইন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক মনে হয় এবং এর প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে দেশের অধিকাংশ ছোট ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বন্ধ রয়েছে, সেটা দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য অশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দেশের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। বিদ্যুত বিভাগ নিজের কর্মচারিদের সামলাতে পারছেনা কিন্তু তার জন্য জরিমানা দিতে বাধ্য হচ্ছে দেশের নিরীহ জনসাধারণ।

আরও অধিক শ্রম নিয়োগের জন্য নতুন নতুন কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে বর্তমানে দেশের শ্রমিক অসন্তোষ বা শ্রম জগতের ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলতা একটা বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে নবাগতরা এমন শিল্প বেছে নিতে চাচ্ছেন যাতে শ্রমিকের প্রয়োজন খুব কম হয়। শ্রম প্রধান কোন শিল্পেই কেউ যেতে চাচ্ছেনা।

www.pathagar.com

তার কারণ হলো শ্রমিকদের উগ্রতায় ও আন্দোলনে সবাই তটস্থ। বাংলাদেশ হওয়ার পর বিদেশী সাহায্য হিসাবে ১৯৭৫ সনের পরে প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা এসেছে যার অধিকাংশ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পড়েছে। যাদের হাতে এটাকা পড়েছে তাদের অধিকাংশই শুধু ট্রেডিং করে যাচ্ছেন যাতে শ্রমিকের প্রয়োজন মোটেই হয় না। আর যারা শিল্প ক্ষেত্রে আসছেন তারাও যতদূর সম্ভব পুরাপুরি অটোমেটিক মেশিন খুজছেন যাতে শ্রমিকের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব কম হয়। গত কয়েক বৎসরে শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা যত কোটি টাকার ঋন দিয়েছে খোঁজ নিলে দেখা যাবে তার অধিকাংশই ট্রান্সপোর্ট, জাহাজ, ট্যান্কার বা স্বয়ংক্রিয় কারখানার জন্য দেওয়া হয়েছে যাতে শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা খুব সীমাবদ্ধ। এ অবস্থার জন্য শ্রমিক, না মালিক সমাজকে দায়ী করা উচিৎ বলা শক্ত। দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতির সুযোগ নিয়ে শ্রমিক জগতে বেশ কিছু দূর্নীতিবাজ ও প্রফেশনাল নেতার আবির্ভাব হয়েছে যাদের নীতি হলো বেশী পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শ্রমিকদের উত্তেজিত করে ধর্মঘট বা গণ্ডগোলের দিকে ঠেলে দেওয়া। আজকাল শ্রমিক নেতৃত্বে এটা বেশ লোভনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জুটমিল, কটনমিলগুলির এক একটিতে কমপক্ষে পাঁচ সাত হাজার শ্রমিক কাজ করে। এরূপ এক একটি মিল থেকে সময়ে ২০/২৫ হাজার টাকা চাঁদা আসে। এরকম চার পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব স্থাপন করতে পারলে মাসে কমপক্ষে লাখ খানেক টাকা হাতে আসে যার সিংহভাগই বিভিন্ন অজুহাতে নেতাদের পকেটে যায়। তাই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিদ্বন্দিতা নিয়ে প্রায় শিল্প এলাকাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা, ধর্মঘট' অশান্তি লেগেই আছে। এদিকে নুতন নুতন রাজনৈতিক দলের জন্ম হচ্ছে। তারাও শিল্প এলাকাতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য নুতন শ্রমিক সংগঠন তৈরী করে নিজেদের শক্তি দেখাতে চায়। তাতে প্রত্যেক সংগঠনই নুতন নুতন দাবী দাওয়ার প্রশ্ন তুলে শ্রমিকদের দলে টানবার চেষ্টা করে। শ্রমিকরাও এ আহ্বানে সাড়া দিচ্ছে কিছুটা লোভে পড়ে। কিন্তু প্রধানতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম যে ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে দুমাস আগে মালিকের সংগে যে চুক্তি করেছে সে মাইনেতে আর পোষাচ্ছেনা বলে তাই নুতন এক নেতা যখন আরও বর্দ্ধিত

www.pathagar.com

সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্দোলনের ডাক দেয় তখনই সে ছয়মাস পূর্বের চুক্তি ভংগ করতে প্রলুব্ধ হয়। এই অবস্থার জন্য দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা অনেকাংশে দায়ী যার ফলে দেশের সর্বক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, সাধারণ মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে দুর্নীতির অতলে দেশ তলিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থার জন্য সরকারের অবাস্তব অর্থনীতিই একমাত্র দায়ী। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যয় না করে ক্রমাগত অনুৎপাদক ক্ষেত্রে ব্যয় করার পরিণতি। তেলের জন্য ইনফ্লেশন জগৎব্যাপী হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা যে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এরূপ আর কোথাও হয়নি। আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য রাষ্ট্র তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে যারা প্রায় একই রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সব কোন দেশেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম এভাবে বাড়েনি এবং মুদ্রাস্ফীতিও এরূপ মারাত্মক আকারে দেখা দেয়নি।

উপরে শ্রমিকদের অসন্তোষের কথা বলতে গিয়ে মালিকদের কথাও বলেছি। শ্রমিক অসন্তোষের জন্য শুধু শ্রমিকদের এক তরফা দায়ী করলে চলবেনা। অনেক ক্ষেত্রে মালিকদেরও বেশ দোষ আছে। তারাত লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে, দুদিনে গাড়ী বাড়ি করে, রাজার হালে থাকতে চাইবে। কিন্তু যাদের দিয়ে এ অর্থ উপার্জন করা হলো তাদের সে উপার্জনের একটা নায্য অংশ দিতে প্রায়ই কার্পণ্য করে। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। মালিক হিসাবে আমি পাঁচ তলার উপরে থাকব আর আমার শ্রমিক যেন কমপক্ষে একতলা বাড়িতে থাকতে পারে এরূপ সুযোগ তাকে করে দিলে বা মালিকদের এরূপ মনোভাব থাকলে শ্রমিক মালিকের সহ-অবস্থানে বোধ হয় কোন অসুবিধা হয় না।

দেশকে দ্রুত শিল্পায়নের পথে উপসংহারে যে অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে এটার সমাধান একমাত্র সরকারের হাতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও মূল্যের ব্যাপারে স্থিতিশীলতা এনে শ্রমিক অসন্তোষ যদি অচিরে দূর করা না হয় এবং আইন শৃঙ্খলার উন্নতি করে কিছু সংখ্যক দুর্নীতি পরায়ন শ্রমিক নেতার অশুভ প্রভাব থেকে সাধারণ অশিক্ষিত শ্রমিকদের মুক্ত করার কোন বাস্তব সম্মত প্রচেষ্টা না হয়, তবে শ্রমপ্রধান শিল্প গঠন যেটা দেশের বৃহত্তর শ্রমিক গোষ্ঠির কর্ম সংস্থানের জন্য একান্ত জরুরী, তাতে কেউ এগিয়ে আসবেনা। ফলে দেশ চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী ও ভারতীয় মুদ্রামানের তারতম্যের কারণ

বাংলাদেশ ও ভারতের মুদ্রা মানের পার্থক্য দিন দিনই বেড়ে চলছে যদিও পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে ভারতীয় মুদ্রার চাইতে পাকিস্তানের মুদ্রার দাম খানিকটা বেশী ছিল। তখন পাকিস্তানের একশত টাকার বিনিময়ে ভারতীয় একশত দশ টাকা পাওয়া যেত। কিন্তু কালক্রমে পাকিস্তানের টাকার মূল্য কমে যেতে যেতে খোলা বাজারে ভারতীয় একশত টাকার তুলনায় পাকিস্তানের একশত টাকার মূল্য এসে দাঁড়ায় আশি টাকায়। পাকিস্তান ভেঙ্গে দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বিনিময় হার দ্রুত হ্রাস পেতে পেতে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে বেয়াল্লিশ টাকার কাছাকাছি, যদিও ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় বাংলাদেশী মুদ্রার "অফিসিয়েল রেট" প্রায় চুয়াল্লিশ টাকা।

এইভাবে খোলা বাজারে বাংলাদেশী মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত কমে যাওয়ার ফলে চোরা চালানের পরিমান বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। সীমান্তের এপার থেকে হুণ্ডিতে যারা টাকা পাচার করতে চায় তারা নগদ টাকা পাচারের চাইতে মাল পত্রের মারফত পাচার করলে বাটা অনেক কম দিতে হয় বলে বাংলাদেশ থেকে মাল পাঠানোই অধিক সুবিধাজনক মনে করে। ফলে চোরা চালানের পরিমান দিন দিন বেড়েই চলছে যার ফলশ্রুতিতে সীমান্তের লেন দেনে ভারতীয় মুদ্রার চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের মুদ্রামূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে যদি অচিরে বাস্তবসম্মত কোন ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের একশত টাকা ভারতীয় ১৫/২০ টাকায় এসে দাঁড়াবে, যার ফলে চোরা চালান আরও বাড়তে বাড়তে আমাদের অর্থনীতি একদিন সম্পূর্ণ ভেংগে পড়বে।

পাকিস্তান আমলে যে চোরাচালান না হত তা নয়। তবে সীমান্তের এপার থেকে এক তরফা ভাবে চোরাচালান এত মারাত্মক আকার ধারণ করেনি, কারণ অর্থের আদান প্রদান প্রায় সমান সমান ছিল।

www.pathagar.com

এটাকে "টু-ওয়ে ট্রাফিক" বলা যেত, কিন্তু বর্তমানে যেটা চলছে তাকে প্রায় "ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক" বলা যায়। ওয়াকিফহাল মহলের মতে তখন টাকার আদান প্রদান দুদিকেই প্রায় কাছাকাছি থাকার কারণগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ বিশেষ করে কলকাতার অবাংগালী মুসলমানেরা তাদের সারা বৎসরের আয়ের উদ্বৃত্ত অংশটি তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে পাঠিয়ে দিত। এইখানে স্মর্তব্য যে গরিব চাষিদের হাতে উদ্বৃত্ত প্রায় কখনও থাকেনা, তাই পাঠাবার প্রশ্ন উঠে না। উদ্বৃত্ত থাকে শিল্পপতী, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতির নিকট। পাক আমলে বিহার, উড়িষ্যা ও কলকাতার অবাংগালী মুসলমান ব্যবসায়ীরা যেমন এদিকে তাহাদের আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ পাঠাত, তেমনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্য, ওকালতি, ডাক্তারির সংগে জড়িত ছিল তারাও তাদের উদ্বৃত্ত অংশ নিয়মিত সীমান্তের ওপার আত্মীয় স্বজনের কাছে পাঠিয়ে দিত। এর ফলে দুদিকের অর্থের লেন দেনের মধ্যে মোটামুটি একটা সমতা বিরাজ করত বলে বাটার হারের মারাত্মক অবনতি কখনও ঘটেনি। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সীমান্তের ওপার থেকে অবাংগালীদের টাকা আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলেও, এদিক থেকে যাওয়াটা বন্ধ হয়নি। তাই অর্থের দু-তরফা ট্রাফিকের বদলে এখন এক তরফা ট্রাফিক দাঁড়িয়েছে বলেই বাংলাদেশী মুদ্রার বর্তমান দুরবস্থা। সীমান্তের চোরাচালান সব দেশেই হয়। পাকিস্তান আমলেও হত। এটা পুরাপুরি বন্ধ করা কোন দেশের পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। তবে চোরাচালানের পরিমান যখন দু-দিকেই প্রায় সমান সমান হয়, তখন সরকার শুল্ক আয় হতে বঞ্চিত হ'লেও উভয়দেশের অর্থনীতির উপর সাধারণতঃ তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না।

২। বর্তমান দুরবস্থার দ্বিতীয় কারণ ১৯৬৫ সনের পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এদেশের কাঁচা পাটের রপ্তানি ব্যবসার সিংহভাগ মাড়োয়ারিদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে তখন প্রতি বৎসর পাটের মৌসুমের শুরুতে পাট কেনার জন্য বেশ কয়েক কোটি টাকা তারা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে নিয়ে আসত, যদিও বৎসরের শেষে মুনাফা

www.pathagar.com

সহ এঅর্থ তারা ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। তথাপি এক সংগে বেশ মোটা রকমের টাকা এদেশে আসত বলে লেন দেনের ব্যাপারে কখনও মারাত্মক রকমের ঘাটতি হতনা। হুণ্ডির বাজারে ভারত পাকিস্তানের পারস্পরিক মুদ্রামানের তারতম্য যারা বরাবর লক্ষ্য করে আসছেন তাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতের টাকার মূল্যের মধ্যে এত অধিক পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের পর মাড়োয়ারিদের ব্যবসা এদেশে প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, পাটের মৌসুমে আসা টাকাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে উভয় দেশের মুদ্রামানের পার্থক্য হঠাৎ করে কিছুটা বেড়ে গেল।

৩। তৃতীয় কারণ হল বাংলাদেশ বা তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ লোকের তীর্থ যাত্রী হিসাবে ভারতে গমন। প্রতি বৎসর আজমীর শরীফ ও ফুরফুরা শরীফে জেয়ারত ও মানত পালনের জন্য কম করে হলেও এক লক্ষ লোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করে থাকে। তারা সরকারি ভাবে যদিও সামান্য অর্থই সংগে নেয় কিন্তু বে-সরকারী ভাবে অর্থাৎ হুণ্ডির মারফতে হাজার হাজার টাকা নিয়ে যায়। প্রতি বৎসর যদি এক লক্ষ লোক তীর্থ যাত্রী হিসাবে ভারতে যায় তবে তাদের মারফতে বাংলাদেশ থেকে কম পক্ষে ২০/৩০ কোটি টাকা ভারতে পাচার হয়, যার ফলে আমাদের মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত কম হয়ে যাচ্ছে। ভারত থেকেও যদি লাঙ্গল বন্ধের স্নান, সীতাকুণ্ডের মেলা প্রভৃতি উপলক্ষে কয়েক হাজার তীর্থ যাত্রী আসত তবে আমাদের মুদ্রা এরূপ প্রতিকুল চাপের সম্মুখীন হত না। এ সর্ম্পকে বিখ্যাত আইনজ্ঞ, লেখক ও চিন্তাবিদ জনাব কামরুদ্দীন আহম্মদ সাহেব যিনি ১৯৫৬-৫৭ সালে কলকাতায় পাকিস্তানের "ডেপুটি হাইকমিশনার" ছিলেন, তার লেখা "বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনীতে" তিনি যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন "ভারতের মুদ্রা মানের সংগে পাকিস্তানের মুদ্রা মানের এত পার্থক্য কেন" এ সর্ম্পকে অনুসন্ধান করে আমি কয়েকটি কারণ খুঁজে পেলাম। সেগুলি হল ঃ-

ক। পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে পৃথক মুদ্রা রয়েছে এবং সে মুদ্রা যদি এক তরফা ভারতে আসে, আইনের মাধ্যমে বা বে-আইনি ভাবে, তবে পূর্ব বাংলার মুদ্রামান হ্রাস পেতে বাধ্য। আজমীর, দিল্লী

www.pathagar.com

ছাড়াও উত্তর ভারতে ও পূর্ব ভারতে পূর্ব বাংলার লোক সুযোগ পেলেই আসে হাজারে হাজারে তাদের মানত পালন করতে। আর তার মধ্যে বেশির ভাগই হুণ্ডি করে বহু টাকা আনে। পাকিস্তানী একশত টাকায় তারা পঞ্চাশ টাকা পায়। দিল্লীতেও তেমনি যত দরগা শরীফ আছে সে সব দরগায় মানত করে। ভিসা না দিলে খাদেমের নিকট হুণ্ডি করে টাকা পাঠায়। তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসে ভারতে। কিন্তু ভারতের কেউ "গাঙ্গল বন্ধ স্নান" করতে যায়না পূর্ববংগে। পূর্ব বংগের ধার্মিক মুসলমানেরাও ঐভাবে চুরি করে টাকা পাঠানোকে পাপ মনে করেনা।

খ। বৎসরে একবার করে পূর্ব বংগের খাদেমরা তশরিফ নিয়ে যান ভারতে বিশেষ করে আজমীর শরিফ ওরসের পূর্বে। আর তাদের হাতে ধনী, দরিদ্র সবাই সওয়াব কামাবার জন্য যাঁর যাঁর সাধ্য মতে টাকা দিয়ে দেন, দোয়া চাইবার জন্য।

গ। পূর্ব বাংলার যে কোন আনন্দ উৎসবে কলকাতা থেকে "আর্টিস্ট" বা গায়ক, গায়িকা নিয়ে যাওয়া হয়। পাঁচশো থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের প্রত্যেককে দিতে হয় প্রতি সন্ধ্যার জন্য। আর সে টাকা খুব কমই আসে স্টেট ব্যাংকের মারফতে। অধিকাংশ আসে হুন্ডিতে।

ঘ। এর উপর আবার জৌনপুরী মাওলানা সাহেবদের পূর্ব বংগের আয় আসে বে-আইনি পথে। তদানীন্তন ঢাকা স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার লোকমান হায়দারকে জিজ্ঞাসা করে আমি জেনেছিলাম যে ১৯৪৭ সন—১৯৫৭ সন পর্য্যন্ত জৌনপুরে স্টেট ব্যাংকের মারফতে কোন টাকা আসেনি।

ঙ। পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তের ভারতীয় শাড়ি প্রীতি, নিত্য নুতন ফ্যাশনের স্বর্নালঙ্কার, কাপড় জামা আর কসমেটিকস্ ব্যবহার করার বাসনা এই সব মিলিয়ে পূর্ববাংলা হয়েছে ক্রমাগত দরিদ্র। এর একটা বড় কারণ বোধ হয় পূর্ববাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উৎপাদন ব্যবস্থার অভাব।

এসব ছাড়া ছোট খাটো অনেক কারণ রয়েছে যার জন্য চোরা-চালান বন্ধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে

www.pathagar.com

সীমান্ত বাহিনী বা পুলিশ দিয়ে চোরা চালান বন্ধ করা সম্ভব নয়। এর উপর রয়েছে তাজমহল দেখা। পশ্চিম বংগে যাদের বাড়ী-তারা বেড়াতে যায় খরচ করে কিন্তু কোন হিন্দু ঢাকা আসেনা। বরং এখানকার হিন্দুরা তাদের আত্মীয় স্বজন দেখতে যায়। তার পর রয়েছে ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখা। এটা যে মুদ্রা মূল্যের সংগে কতটা জড়িত সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের সচেতনা বোধের অভাব। অর্থনৈতিক বেড়া-জাল সৃষ্টি করতে না পারলে সতের হাজার বর্গমাইল পাহারা দিয়ে চোরাচালান, কালোবাজারী বা সীমান্তের ঘুষ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

কমরুদ্দীন সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তীর্থ যাত্রা ও ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দর্শনের লোভে বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে যেভাবে লক্ষাধিক লোক ভারতে গমন করছে, আমাদের অর্থনীতিকে বাচানোর জন্য হয় এটা বন্ধ করতে হবে নচেৎ অন্য দিক থেকেও যাতে প্রচুর ভারতীয় বাংলাদেশে তীর্থ বা ভ্রমনের উদ্দেশ্যে আগমন করেন তার বন্দোবস্ত করতে হবে। আমরা মনে করি একটু ভালভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত করলে ভারত থেকে লাঙ্গল বন্ধের স্নান, সীতাকুণ্ডের মেলা প্রভৃতিতে যোগদান উপলক্ষে আমরা একমাত্র পশ্চিম বংগ থেকেই প্রতি বৎসর বেশ কয়েক হাজার তীর্থ যাত্রী বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বয়স্ক ভারতীয় জনসাধারনের পুন্য লোভের আগ্রহ যে কি গভীর দেশ বিভাগের পূর্বে লাঙ্গল বন্ধের স্নান বা বর্তমানে ত্রিবেনী সংগমে ও কুম্ভমেলায় স্নানের খবর যারা রাখেন তাদের এটা ভালই জানা আছে। তাই উপযুক্ত প্রচারের মাধ্যমে হাজার হাজার তীর্থ যাত্রী ও কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এবং কুমিল্লার ময়নামতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থান দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিদের আমাদের বাংলাদেশে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, আর সে দায়িত্ব নিতে হবে পর্যটন কর্পোরেশনকে। তীর্থ যাত্রীদের স্বল্প খরচে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। তীর্থস্থানে অস্থায়ী শিবির প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প খরচে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। বিভিন্ন তীর্থস্থানে পর্যটনের সময় নিরাপত্তার পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। মধ্যবিত্ত টুরিষ্টদের জন্য মোটামুটি যুক্তিসংগত ব্যয়ে থাকা, খাওয়া ও যাতায়াতের বন্দোবস্ত করতে হবে। তাহলে এটা স্থির নিশ্চিত

www.pathagar.com

যে ভারত হতে প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ-দুই লক্ষ তীর্থযাত্রী ও টুরিষ্ট পাওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে না। এক দেড় লাখ টুরিষ্ট এদেশে এসে যে টাকা খরচ করবে তার পরিমানও ২৫/৩০ কোটি টাকার কম নয়। এতটাকা সীমান্তের অপর পার থেকে এদিকে আসলে সংগে সংগে আমাদের টাকার মূল্যমান বেড়ে যেতে বাধ্য এবং তার ফলে চোরাচালান অনেকটা কমে যাবে যার প্রতিক্রিয়া হবে আমাদের অর্থনীতির উপর অত্যন্ত দ্রুত। আমরা মনে করি পর্যটন কর্পোরেশনের টুরিষ্ট আকর্ষণের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভারতের দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিৎ। অন্যান্য দেশের চাইতে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের সংগে আমাদের বাংলাদেশের পরিবেশের মিল রয়েছে অনেক বেশী। তাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাইতে ভারতীয়রাই এদেশে অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিন ভারতের অধিবাসিদের সংগে আলাপ করে দেখা গেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাদের কৌতুহল অত্যন্ত প্রবল। অধিকাংশ লোক বাংলাদেশ দেখে যেতে চায় কিন্তু যাতায়াতের অনিশ্চয়তা, সস্তা হোটেলের অভাব, বিশেষ করে ভিসা সংগ্রহের ঝামেলায়, ইচ্ছা থাকা সত্বেও অনেকে আসতে চায় না। সাধারণ ভারতীয়দের জন্য সোনারগাঁও হোটেল, কন্টিনেন্টাল বা পূর্বানী একটু ব্যয় সাপেক্ষ। দৈনিক থাকা খাওয়া নিয়ে ২৫/৩০ ডলার বা তার চেয়েও কিছু সস্তায় হোটেলের বন্দোবস্ত পর্যটন কপোরেশনকে করতে হবে। ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই আছে নিরামিষভোজি। প্রচারের মাধ্যেমে এখানে অনেক হোটেলই আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যের বন্দোবস্ত আছে এটাও জানাতে হবে।

এসম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানে শিখ তীর্থযাত্রীদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উপযুক্ত প্রচার ও পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে লাহোরের বিভিন্ন স্থানে গুরুদ্বার সমূহ তীর্থ করার জন্য প্রতি বৎসরই কয়েক হাজার শিখ তীর্থযাত্রী গমন করে এবং এদের সংখ্যা প্রতিবৎসর বেড়েই চলছে। এর থেকে পাকিস্তান সরকারের প্রতি বৎসর মোটা রকমের একটা আয় আসে।

আলাপ করে দেখা গেছে পাকিস্তান আমল থেকে আমাদের

www.pathagar.com

দেশে অনেকের মধ্যে একটা ভয় আছে যে ভারতীয় নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তানে বা বর্তমান বাংলাদেশে আসা সহজ করে দিলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। যাতায়াতের সহজ সুযোগের সুযোগ নিয়ে বহু অন্তরঘাতি লোক এদেশে ঢুকে পড়বে। আমরা মনে করি এরূপ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। "সাবোটিয়ার" বা দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা তারা কখনও 'ভিসা পাস্‌পোর্ট" নিয়ে এদেশে আসবে না। ১৭০০ মাইল বর্ডার দিয়ে তারা যে কোন সময় যতবার ইচ্ছা বিনা ভিসায় আসা যাওয়া করতে পারে। ভিসা পাসপোর্ট নিয়ে নিশ্চিন্ত-ভাবে শান্ত লোকেরাই আসবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এদেশে প্রচুর টুরিষ্ট আসলে অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও এখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা ভারতে যত অধিক প্রচারিত হবে ততই দুদেশের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি গড়ে উঠবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয়দের অধিকাংশের মনে একটা দারুণ ভীতি, তাচ্ছিল্য বা ঘৃণার ভাব রয়েছে। ক্রমাগত অপ-প্রচারের ফলে তাদের ধারণা রয়েছে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। আইন শৃঙ্খলার কোন বালাই নাই। সংখ্যালঘুরা এখানে সব সময় নিগৃহিত ও অত্যাচারীত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে সাধারণ ভারতীয়দের মনে একটা তাচ্ছিল্য ও বিদ্বেষের ভাব ক্রমাগত গড়ে উঠছে। যাতায়াত যত সহজ করা হবে, দুদিকে যত বেশী লোক যাতায়াত করবে, ততই এসব ভুল ধারনার নিরশন হবে, আর দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সত্যিকারের সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে যা আজকের দিনে অত্যন্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com